দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্যা
(Floods)

বন্যা হল এক ক্রমান্বয়ী বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ যা আবহাওয়ার উপাদানগুলির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দীর্ঘ সময়ভিত্তিক এক ক্রমান্বয়ী ফলাফল সৃষ্টি করে।

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যদিও তা সৃষ্টিতে মানুষেরও হাত রয়েছে। বন্যা কী? নদী যখন আগত জলরাশিকে তার গর্ভে ধরে রাখতে পারে না, তখন তা (River-bed) দুকূল ছাপিয়ে তীরবর্তী জনপদকে প্লাবিত করে।* একেই বন্যা বলে। Shakespeare তাঁর অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা-তে বন্যা ও মানুষের সম্পর্কের এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

They take the flow of the Nile

.....

The higher the Nilus Swells

The more the promises

---

* তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই বন্যা বলতে নদীসৃষ্ট বন্যার কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যদিও নদীর বন্যা ছাড়াও বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আরও সম্ভাবনা থাকে, যেমন জাপানে সাম্প্রতিককালে (মার্চ, 2011) সুনামির সময় ঘটে যাওয়া প্লাবন। ভেন্ টি চাউ (Ven te Chow, 1956) বন্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়েও নদীর সঙ্গে বন্যার সম্পর্ককেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে (A flood is a relatively high flow which overtakes the natural channel provided for the run off.)। বন্যা হল এমন এক বাড়তি জলের প্রবাহ যা স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য নির্দিষ্ট নদীখাতের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। রুজভেল্ট (Rostveldt) এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী (১৯৬৩) বন্যার সংজ্ঞাকে মানুষের বন্যারোধকারী চেষ্টা, কৃত্রিম প্রবাহপথ সৃষ্টি ইত্যাদির কথা মনে রেখে আরও বাস্তবসম্মত করতে চেয়েছেন : (''Flood is any high stream flow which over-tops natural on artificial banks of a stream.'')। বন্যা হল নদীর জলের এমন এক উচ্চমানের প্রবাহ যা নদীর প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পাড়গুলিকে ছাপিয়ে যায়। তবে এইসব সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার বাইরে সম্ভবত আর একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারের দিক দিয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞার প্রয়োজন। রয় ওয়ার্ড (Roy Ward, 1978) এই সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : (A flood is a body of water which rises to overflow land which is not normally submerged.) বন্যা হল এমন এক জলপ্রবাহ যা নদীর পাড় ছাপিয়ে যায় এবং সাধারণত ডুবে যায় না এমন এলাকাকে প্লাবিত করে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে কবি নীলনদের বন্যা ও মিশরবাসীদের তা থেকে উপকৃত হওয়ার যে দৃশ্য এঁকেছেন, আজকের মানুষ অনেকটা অজ্ঞতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে কথা মাথায় রাখে না। তাই অরণ্য ধ্বংস করে গড়ে ওঠে নতুন নতুন জনপদ ও কৃষিভূমি। শুরু হয় নদী উপত্যকা দখল। স্বাভাবিক কারণে নদীও তার আপন গতিপথ ফিরে পেতে চায়। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়, মানুষ ও নদীর মধ্যে এক যুদ্ধ। মানুষ চায় বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকাতে, নদীর পাড় বেঁধে ভূমিক্ষয় রোধ করতে। কিন্তু মানুষের এই নদী শাসন খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। বরং বন্যার ভয়াবহতা বাড়ে, বাড়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি। এবার বন্যার কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বন্যার কারণ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট, কিংবা উভয়বিধ হতে পারে। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল—

বন্যাকে সাধারণত একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ পৃথিবীর কোনো নদীই এখন আর মানুষের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, প্রায় সব নদীই নানাভাবে, কমবেশি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যা সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে মানুষের দ্বারা বন্যা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া বন্যাকে বিপর্যয় বলা যায় কি না তা নিয়েও বিতর্ক আছে। পৃথিবীর অনেকগুলি অঞ্চল বেশি মাত্রায় বন্যাপ্রবণ যেমন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপির বদ্বীপ, চিনের হোয়াংহো উপত্যকা, নিম্ন দামোদর উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গাঙ্গেয় সমভূমি, মায়ানমারের ইরাবতী, পাকিস্তানের সিন্ধু, আফ্রিকার নাইজার বদ্বীপ প্রভৃতি। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটিই ঘন বসতিযুক্ত এলাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং বন্যাকে কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়ে এইসব এলাকায় বাস করছেন ও জীবনধারণের উপযোগী কাজ খুঁজে পেয়েছেন। যে প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থানীয় মানুষ বিপদ হিসাবে গণ্য করে না, সেটিকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে নদী প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার করে চলেছে। আমরা জানি যে, 'মিশর নীল নদের দান'। কারণ নীল নদের প্লাবিত জলে প্রতি বছর যে বন্যা হত, তার মাধ্যমেই এই মরুপ্রায় দেশে পলল সঞ্চিত হত। বন্যার দান এই পলিমাটি সে দেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতির উন্নতির মূলে রয়েছে। সুতরাং দুর্যোগ নয়, প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বন্যাকে 'সম্পদ' হিসাবে দেখে এসেছে। নদীর রোষ ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নদীর জলের বাড়া-কমার সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে নদীর পাশে বসবাস করছে।

তুলনীয়— নদীর পাড়ে যাদের বাস, / ভাবনা তাদের বারোমাস।

বন্যার কারণ (Causes of Floods)

বন্যার কারণগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় তাদের মধ্যে কতকগুলি জলবায়ু ও আংশিকভাবে অন্য কোনো কারণের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়াও জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন কারণেও বন্যা হতে পারে। এই কারণগুলিকে নিম্নোক্ত সারণিতে দেখানো হল।

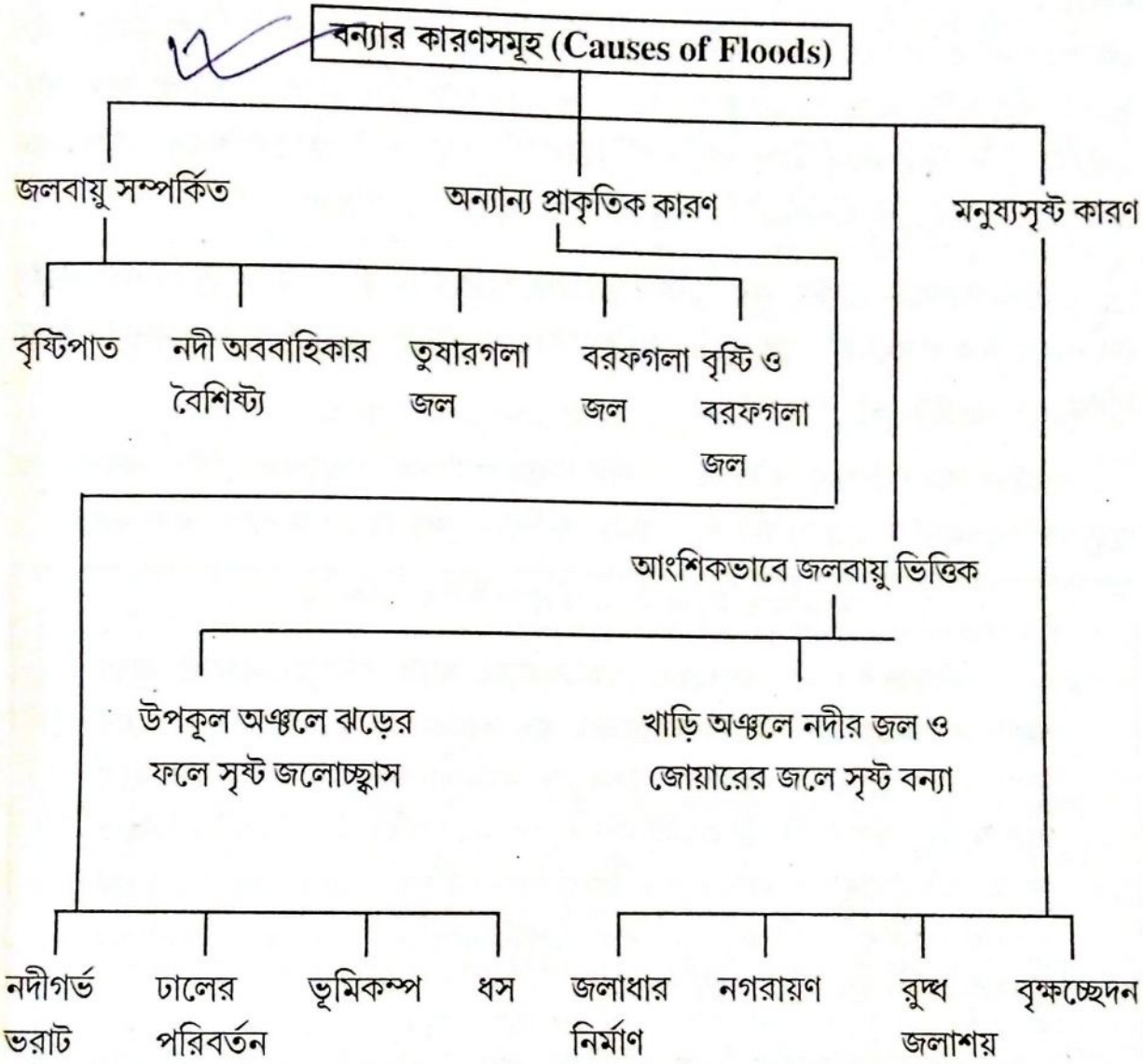

১। জলবায়ু সম্পর্কিত কারণ

বৃষ্টিপাত

কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা যথেষ্ট বেশি হলে সেখানে বন্যা হয়। এ প্রসঙ্গে 1999 সালের জলপাইগুড়ি শহরের বন্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই বছরের 9 জুলাই একদিনে জলপাইগুড়ি শহরে 474 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল যা বিগত

বছরের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। উল্লেখ্য 8 জুলাই, 1892 সালে জলপাইগুড়িতে 391 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। একদিনের অতিবর্ষণ যে ওই শহরে বন্যার অন্যতম কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোদ্দাকথা, বছরের কোনো এক সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি হলে বড়ো নদীতেও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোটো নদীর ক্ষেত্রে খুবই অল্প সময়ের ঝড়-বৃষ্টি থেকেও বন্যা হতে পারে। বেশি বৃষ্টির সময়ে বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে মাটির মধ্যে অনেক জল থেকে যাওয়ায় বাড়তি জল নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। একটানা বেশ কিছু সময় ধরে সমহারে বৃষ্টিপাতও বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। কোলম্যান (Colman, 1953) বৃষ্টিপাতজনিত বন্যাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন*।

দীর্ঘকালস্থায়ী বৃষ্টির কারণে বন্যা (Long rain flood) : এই ধরনের বন্যার কারণ হল কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ জুড়ে প্রায় সমহারে কম তীব্রতাযুক্ত বৃষ্টিপাত। সাধারণত বড়ো ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে এই বন্যা হয়।

হড়কা বান (Flash Flood) : এই বন্যা সাধারণত পরিচলন বৃষ্টির সাহায্যে বা বায়ুমণ্ডলে কোনো সীমান্ত সৃষ্টির ফলে হওয়া অবিরাম বৃষ্টিপাতের সাহায্যে হয়ে থাকে।

মহানন্দার হড়কা বানে ভাসতে পারে শিলিগুড়ি

মহানন্দার হড়কা বানে এবার ভেসে যেতে পারে শিলিগুড়ি শহরের বড়ো অংশ। এ বছরও হিলকার্ট রোড পুরোটা যান চলাচলের উপযুক্ত হবে না। এর কারণ, পাগলাঝোরায় মহানন্দার উৎসমুখে বড়োমাপের জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে। এই জলাধারটি যদি এখনই নষ্ট না করা হয় তাহলে 1968 সালের তিস্তার বন্যার মতো মহানন্দাও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। রবিবার এক প্রশ্নের উত্তরে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগের প্রতিনিধিদলের অধ্যাপক সুবীর সরকার।

শিলিগুড়ির ফুসফুস হিসেবে চিহ্নিত মহানন্দা নদী সৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ি শহর থেকে প্রায় 37 কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ি-কার্সিয়াং রুটের হিলকার্ট রোডের শিবখোলা বন থেকে। বাবুখোলা, পাগলাঝোরা ও শিবখোলার জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহানন্দা। মূলত ওই 3টি পাহাড়ি ঝোরার মিলনস্থল থেকে প্রায় 500 ফুট

* ল্যামবার্ট (Lambert 1956) বন্যার যে সাতটি ভাগ করেছেন তার মধ্যে তিনটি বৃষ্টিপাতজনিত। এগুলি হল যথাক্রমে : স্থানীয় পরিচলন বৃষ্টি ; ঘূর্ণ বৃষ্টি ; পার্বত্য এলাকার প্রভাবে শক্তিবৃদ্ধি পাওয়া ঘূর্ণ বৃষ্টি। তবে এই শ্রেণিবিভাগের সাহায্যে সবরকম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাকে যুক্ত করা যায়নি। বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়।

উঁচুতে রয়েছে হিলকার্ট রোডের লোয়ার পাগলাঝোরা এলাকা। 2010 সালের 16 জুনের বড়ো মাপের ধসের কারণে হিলকার্ট রোডের পাগলাঝোরা দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পাগলাঝোরায় সড়ক মেরামতের কাজ করছে। কিন্তু এ বছরও এই রুটে যান চলাচল করবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। কারণ যেভাবে ধস মেরামতের কাজ চলছে তা ক্ষতির তুলনায় উপযুক্ত নয়। এই এলাকার হিলকার্ট রোড ঠিক না হলে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং রুটে ট্রেনও চলবে না। পর্যটনেরও ক্ষতি হবে।

ধসের কারণ খুঁজতেই মূলত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের 4 ছাত্র সহ 8 সদস্যের একটি গবেষকদল অধ্যাপক ইন্দিরা লেপচার নেতৃত্বে শিবখোলা বনের মহানন্দার উৎসমুখে গবেষণা এবং অনুসন্ধান চালান। এই দলের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ইন্দিরা লেপচা ছাড়াও অধ্যাপক পি কে মণ্ডল এবং অধ্যাপক সুবীর সরকার।

এই গবেষকদলটি মহানন্দার উৎসমুখে লক্ষ করেন, একটি জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবেই। এই জলাধার সৃষ্টির কারণ, ধসের আবর্জনা। ধসের আবর্জনা সোজা নীচে ফেলা হয়েছে এতদিন। এই আবর্জনা পড়েছে ত্রিধারায় (বাবুখোলা, শিবখোলা এবং পাগলাঝোরা) দোভান (মিলনস্থল/মহানন্দার উৎসমুখে) বক্ষে। সেখানে প্রায় 4 হাজার বর্গফুটের জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে। এই জলাধারে কমপক্ষে এখন এক লক্ষ ঘনফুট জল জমে রয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র পাগলাঝোরাতেই জল রয়েছে। অন্য দুটি ঝোরা শুকনো। বর্ষা এখনও শুরু হয়নি।

এই জলাধারের বিপদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে গবেষকদলের সদস্য অধ্যাপক সুবীর সরকার জানান, এই জলাধারটিই বিপদ ডেকে আনতে পারে। বর্ষার সময় জলরাশি আরও বেড়ে যাবে। জলের চাপ বাড়বে। হঠাৎ করে বর্ষার সময় যদি এই জলাধার ভেঙে যায় তাহলে মহানন্দায় হড়কা বান দেখা দেবে। এমনটা হলে হিলকার্ট রোড দিয়ে ৬/৭ ফুট জল প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৬৮ সালের তিস্তা যেমনটা ঘটিয়েছিল জলপাইগুড়িতে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে সুবীরবাবু জানান, ওই জলাধারটি এখুনি যদি নষ্ট না করা যায় তাহলে বিপদ ঘটবে। শিলিগুড়িকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে হলে ওই জলাধারটি এখনই ভেঙে দিতে বড়ো বড়ো পাথর ভেঙে ফেলতে হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সুবীর সরকার জানান, ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত ধস হচ্ছে। কারণ মাটি ঝুরঝুরে। তা ছাড়া যেভাবে ধস মোকাবিলায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কাজ করছে তা উপযুক্ত নয়। এর ফলে নদীগর্ভে আবর্জনা বেশি করে জমা

হচ্ছে। ওখানে স্টীল ফ্রেম ও কংক্রিটের ঢালাই করে ধস মোকাবিলায় গার্ডওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরি। উপযুক্ত পদ্ধতিতে কাজ না হলে প্রতিবছর ধস হবে, দোভানে আবর্জনা জমবে। শিলিগুড়ি বিপদের মুখে চলে আসতে পারে। বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জরুরিভিত্তিক চিন্তাভাবনা করা উচিত।

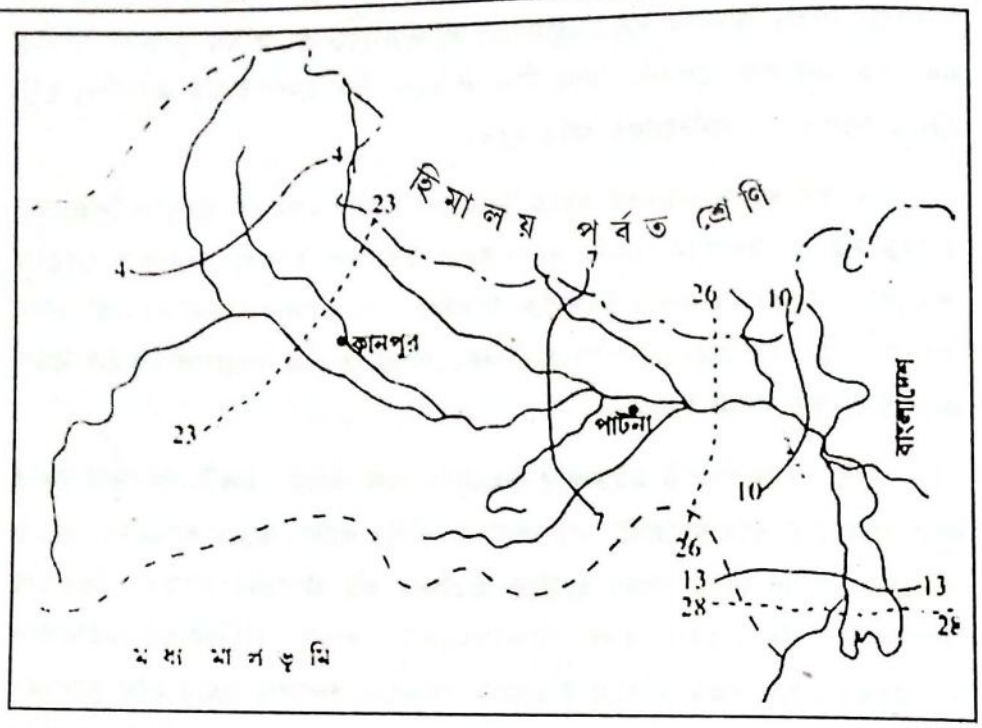

চিত্র 3 ঃ 1978-এর বন্যার সেপ্টেম্বর মাসের দিনভিত্তিক অগ্রগতি

দীর্ঘমেয়াদি বন্যার উদাহরণ 1978 সালে গঙ্গা অববাহিকার উচ্চগতি থেকে নিম্নগতি পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের বন্যার অগ্রগতি সমতারিখ (isodate) রেখা দ্বারা চিত্রে দেখানো হয়েছে। ওই বছর 1, 2 এবং 3 সেপ্টেম্বর তারিখে যমুনা নদীর ধারণ-অববাহিকা অঞ্চলে নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতে যমুনানদীর দু'কূল উপচে জল প্রবাহিত হয় এবং 4 সেপ্টেম্বর দিল্লি শহর প্লাবিত হয়। ধীরে ধীরে বন্যার জল অববাহিকার নীচের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ফলে মথুরা, বৃন্দাবন ও আগ্রা একের পর এক প্লাবিত হয়ে যায়। 7 সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ ও বারাণসী বিপদসীমার কাছে চলে আসে। কিন্তু দিল্লিতে জলের স্তর নেমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 10 সেপ্টেম্বর বারাণসী থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি প্লাবিত হয়। 11 সেপ্টেম্বর এই জলপ্রবাহ রাজমহল পাহাড় অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই অববাহিকা অঞ্চল পুনরায় প্লাবিত হয় যা বিন্দু রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। 22 সেপ্টেম্বর দিল্লি, আগ্রা, মথুরা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলতল বিপদসীমা অতিক্রম করে। 26 তারিখের মধ্যে বিহার পর্যন্ত গঙ্গার জলতল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর প্রধান কারণ হল অববাহিকার উচ্চ অংশ থেকে জলের আগমন।

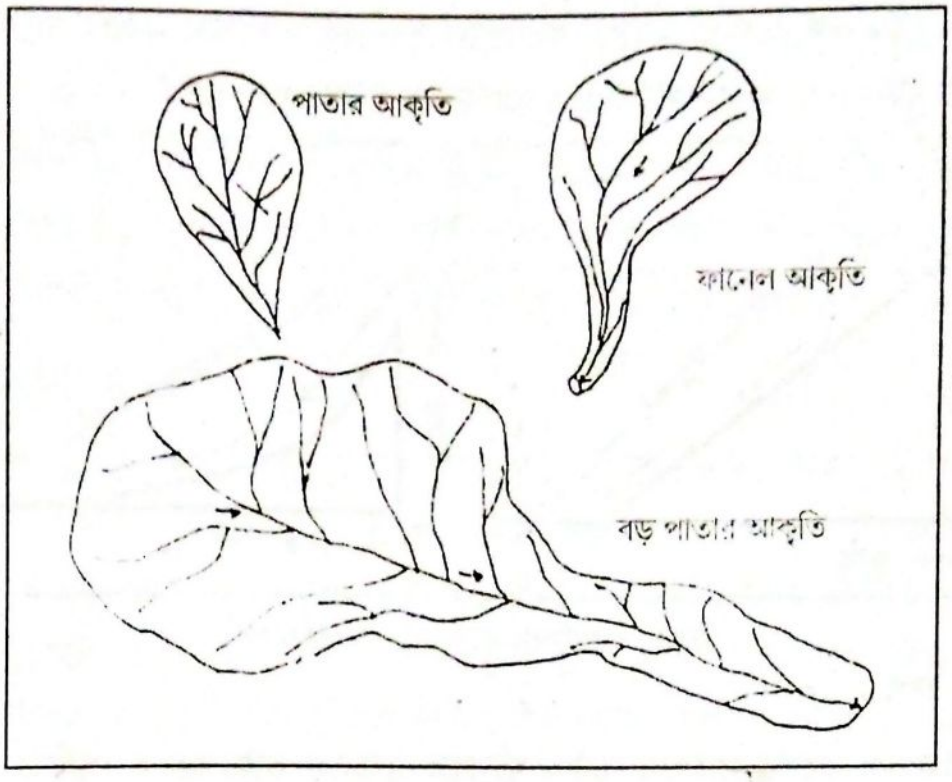

চিত্র 4 ঃ বিভিন্ন প্রকার নদী অববাহিকা

নদী অববাহিকার বৈশিষ্ট্য ও বন্যা :

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নদী অববাহিকা ও বন্যার মধ্যে সম্পর্কের কথা চলে আসে। এ প্রসঙ্গে নদী অববাহিকার আকৃতি, রৈখিক বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্রফলের সঙ্গে বন্যার সম্পর্কের কথা স্বভাবতই মনে আসে। আমরা জানি নদী অববাহিকার বিভিন্নাকৃতি নদীতে বন্যা তথা জল সরবরাহের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ''The shape of the drainage basin mainly governs the rate at which water is supplied to the main stream as it proceeds along its course from the source to the mouth.'' উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পাতার আকৃতি অববাহিকা (leaf shaped basin) কিংবা ফাঁদল (funnel) আকৃতির অববাহিকার তুলনায় বাঁধাকপি আকৃতির (Cauliflower) অববাহিকায় জল নিষ্কাশন তাড়াতাড়ি হয়। গঙ্গানদীর অববাহিকার আকৃতি ছড়ানো ছিটানো। এখানে গঙ্গার উচ্চগতিতে যদি বন্যা হয় তবে ওই জল পশ্চিমবঙ্গে নামতে কয়েক দিন লাগবে। সেই তুলনায় দার্জিলিং জেলার বালাসন নদীর উচ্চগতিতে যদি বন্যা হয় তবে তার জল মোটামুটি পরের দিনই শিলিগুড়িতে নামবে। কারণ বালাসন নদীর অববাহিকা অনেকটা পাতার মতো (leaf shaped)। নদী অববাহিকার ঢালের কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে, কারণ খাড়াই ঢালে জল নিষ্কাশন তাড়াতাড়ি হয়। ফলে উচ্চগতি থেকে বন্যার জল সহজেই নীচে নেমে এসে সমতলের বিস্তীর্ণ

এলাকাকে শীঘ্রই বন্যাপ্লাবিত করে। পক্ষান্তরে মৃদু ঢালু এলাকায় বন্যার প্রকোপ ততটা ক্ষতিকারক হয় না বা আগাম সর্তকতা পেলে মানুষ সর্তক হতে পারে।

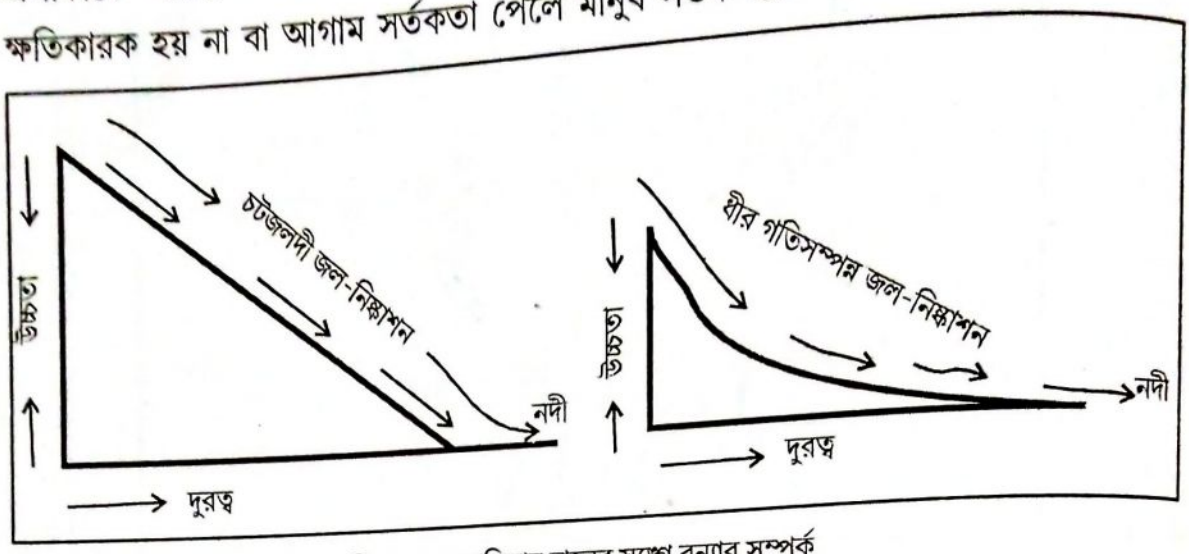

চিত্র 5 ঃ অববাহিকার ঢালের সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক

বরফগলা জল :

বরফগলা জলের সাহায্যে বন্যার ঘটনাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি : একটি হল (1) প্রায় চিরস্থায়ী মহাদেশীয় বরফের স্তরের অবস্থা সংক্রান্ত ও উপত্যকার হিমবাহের প্রভাব সংক্রান্ত এবং আর একটি হল (2) কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে নদীর জল জমে যাওয়া ও পরবর্তী ঋতুতে তার গলন। বরফ সাধারণত তুষারের তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে গলে। তাই কেবলমাত্র বরফগলা জলের কারণে ভয়ংকর বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম। হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলের নদীগুলির জলপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ করলে বোঝা যায়, এইসব নদীতে শীতকালে জলের পরিমাণ খুবই কম থাকে। কিন্তু মে থেকে জুলাই বা আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জলের প্রবাহ হঠাৎ খুব বেড়ে যায়।* শুধুমাত্র বরফগলা জলের সাহায্যে সবসময়ে বন্যা না হলেও পরোক্ষভাবে বরফগলা জল বা বরফের স্তূপ গলে যাওয়ার কারণে বন্যা হতে পারে। হিমবাহ সাময়িকভাবে এগিয়ে এসে অনেকসময় নদীতে বাধার সৃষ্টি করে ও বন্যা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

তুষারগলা জল :

বৃষ্টির জল ছাড়াও তুষার গলা জলও বন্যার কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশে এই কারণে বন্যা হয়। উচ্চ অক্ষাংশের ওই সব দেশগুলিতে খুব বেশি তুষারপাত হয়। ফলে সেখানে দীর্ঘ শীতকালের পরে যখন হঠাৎ তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশি উষ্ণতা থাকে, তখন সেখানে এই ধরনের

* ফরাসি নদীবিজ্ঞানী M. Parde নদীবর্তন (River Regime)-এর এই ধরনের ধাপকে Simple Regime বা সরল নদীবর্তন বলেছেন।

বন্যার সম্ভাবনা থাকে। ফন্ বা চিনুকজাতীয় স্থানীয় বায়ুর ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য হয়। এধরনের বন্যা নদীর নিম্নপ্রবাহের সমভূমি অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়। ইগার্কা এলাকায় ইনিসি নদীর নিম্নপ্রবাহে জুন মাসের গড় প্রবাহ 78,550 কিউসেকের (cf/s) মতো। শুধুমাত্র আমাজন নদীতে এর চেয়ে বেশি জল দেখা যায়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ফ্রেজার নদীতে 1948 সালের তুষারগলা জলের বন্যা এই জাতীয় বন্যার একটি উদাহরণ (রয় ওয়ার্ড, 1978)।

বৃষ্টি ও বরফগলা জল :

বৃষ্টি ও বরফগলা জলের মিলিত প্রভাবের ফলে বন্যা হতে পারে। এই জাতীয় বন্যার ক্ষেত্রে জলের দুটি উৎস থাকায় সহজে জল বেড়ে যায়। উচ্চ অক্ষাংশে বৃষ্টিপাতের অনেকটাই তুষারের আকারে জমা হয়। লক্ষ করে দেখা গেছে যে, 30 সেন্টিমিটার গভীর একটি তুষারের স্তর অনায়াসেই একটি বড়ো ধরনের বৃষ্টিপাতকে শুষে নিতে পারে যা পরবর্তীতে হঠাৎ খুব বেশি পরিমাণে জল তৈরি করে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ বন্যার তুলনায় এজাতীয় বন্যায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি জলপ্রবাহ লক্ষ করা যায়।

২। আংশিকভাবে জলবায়ু ভিত্তিক :

উপকূল অঞ্চলে ঝড়ের ফলে জলোচ্ছ্বাস :

মুক্ত উপকূল অঞ্চলে জোয়ারভাটার প্রভাবে প্রতিদিনই জল ওঠা-নামা করে কিন্তু ঝড়ের সময়ে এই সাধারণ ওঠা-নামার তুলনায় সমুদ্রের জলে বেশি স্ফীতি ঘটে এবং উপকূল অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়। ঝড়ের গতিবেগের ওপর এই জলস্ফীতি নির্ভর করে। নিম্ন অক্ষাংশের সমুদ্রে সৃষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবায়ুর ফলে হারিকেনজাতীয় ঝড় তৈরি হয়। এই হ্যারিকেন, টাইফুন এবং তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন আরও কিছু ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত উপকূল অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। ঘণ্টায় 120 কিলোমিটার থেকে 300 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবল বাতাসের ফলে সমুদ্রজল খুব বেশি উঁচু হয়ে ওঠে। সমুদ্রতলে স্বাভাবিক বায়ুচাপের পরিমাণ হল 1013.20 মিলিবার। লুজন-এ 1927 সালে একটি টাইফুনে সর্বনিম্ন কেন্দ্রীয় বায়ুচাপের পরিমাণ ছিল 886.56 মিলিবার। ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 126.6 মিলিবার বায়ুচাপের পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় 131 সেন্টিমিটার। স্মরণকালের মধ্যে বাংলাদেশে 1970 সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এক ঘূর্ণিঝড়ে 3 লক্ষ লোক মারা যায় এবং 750 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে 20 লক্ষ লোক কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খাড়ি অঞ্চলে নদীর জল ও জোয়ারের জলে সৃষ্ট বন্যা

অনেক সময় খাড়ি অঞ্চলে নদীর জল এবং সমুদ্রের জলের মিলিত প্রভাবে বন্যা সৃষ্টি হয়। খাড়িতে এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তার বেশিরভাগ সময়েই জোয়ারের জলের সঙ্গে নদীর জলের মিশ্রণের ফলে ওই জলতল বন্যা সৃষ্টির মতো বিশেষ অবস্থায় পৌঁছায়। বলা হয়ে থাকে যে ভরা কোটালের সময়ে জোয়ারের জল এত বেড়ে যায় যে নদীর জলের পরিমাণ কম থাকলেও ওই সম্মিলিত জলকে (মরা কোটাল ও নদীর জল) নদীখাতে ধরে রাখতে পারে না। আবার মরা কোটালের সময়ে যদি নদীর জলের পরিমাণ খুব বেশি থাকে তাহলেও উভয় জলে (মরা কোটাল ও নদীর জল) বন্যা হতে পারে।

৩। অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ :

নদীগর্ভ ভরাট

নদীগর্ভ ভরাট হয়ে গেলে নদীর জলবহন ক্ষমতা কমে যায়। ক্রমাগত নদীর পাড় ভেঙে গেলে নদীতে পলি জমা হয়। তা ছাড়া, নিম্নগতিতে বহন ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন নদীগর্ভেই পলি জমা হতে থাকে। ফলে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই নদী দুকূল ছাপিয়ে চারদিক জলমগ্ন করে বন্যা সৃষ্টি করে। দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলিতে এই কারণেই বন্যা হয়।

ঢালের পরিবর্তন

পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নামার সময় পর্বতের পাদদেশ (foot-hill) অঞ্চলে নদীর ঢালের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। ফলে পাহাড় থেকে আসা পলি নদীগর্ভেই পাদদেশ অঞ্চলে জমা হয়। নদীগর্ভ ভরাট হওয়ার দরুন উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়।

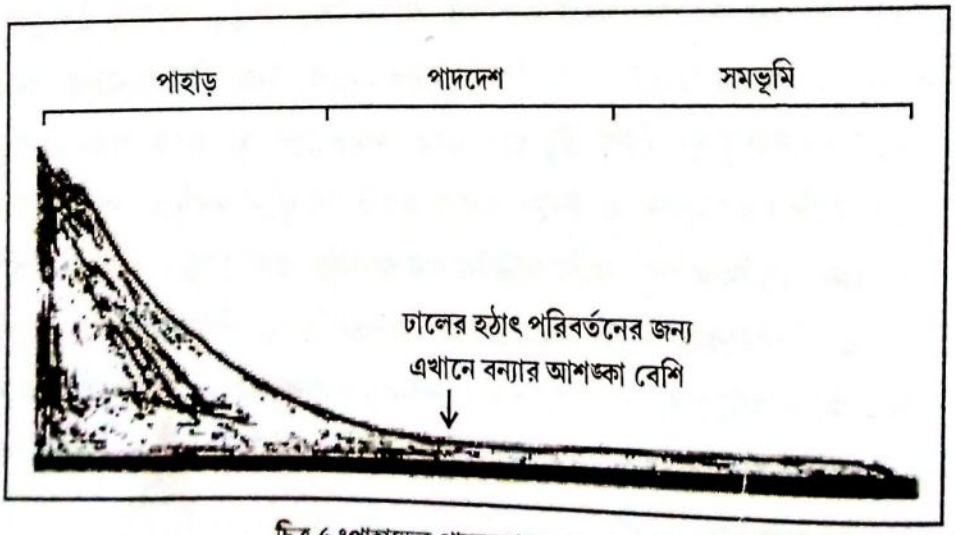

চিত্র ৬ ঃপাহাড়ের পাদদেশে বন্যার কারণ

ধস :

অনেক সময় দেখা গেছে পাহাড়ে ধস নামলে ও একটি বড়ো পাথরের টুকরো নদীগর্ভে পড়লে নদীর স্বাভাবিকগতি বন্ধ হয়ে যায় ও আপনা আপনি প্রাকৃতিক জলাধার তৈরি হয়। এরপর প্রবল চাপে যখন ওই বাধা (পাথরের টুকরো) সরে যায়, তখন প্রচুর পরিমাণে আবদ্ধ জল সমতলে নেমে এসে নদীর দুকূল প্লাবিত করে।

প্রাকৃতিক জলাধারের ভাঙনে বন্যা	
নদী	বছর
সিন্ধু	1841 ও 1858
বিরেগঙ্গা	1893
ভাগীরথী	1978
মালিপাগড় ও কালি	1998
সায়ক	1926 ও 1929
অলকানন্দা	1970
শতদ্রু ও বাগমতী	1993

নদীর গতিপথে যদি প্রচুর বাঁক থাকে তবে জলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। ফলে নদীর প্রবাহিত জল সহজে নিষ্কাশিত (Drain) হতে পারে না, তখন অতিরিক্ত জলপ্রবাহ (discharge) নদীর দু'পাড় ছাপিয়ে প্লাবন ঘটায়।

ভূমিকম্প :

অনেক সময় ভূমিকম্পও বন্যার কারণ হতে পারে। 1988 সালের 20 আগস্ট বিহারের কোশী ও কমলা বালান নদী বরাবর নির্মিত বাঁধে ভূমিকম্পের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং মধুবনী জেলার 50টি গ্রাম ও মুঙ্গের জেলার 30টি গ্রাম জলমগ্ন হয়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ :

(i) **জলাধার নির্মাণ :** বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। এতে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়। তাতে ফি-বছর পলি জমতে থাকে।* ফলে বাঁধের

* পরবর্তী (তৃতীয়) অধ্যায়ে আমরা দেখব দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় (DVC) যেসব জলাধার (পাঞ্চেৎ, মাইথন, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী) নির্মাণ করা হয়েছিল, তাতে কী বিপজ্জনক হারে পলি জমছে ও সেগুলির জলধারণ ক্ষমতা কত কমে গেছে।

জলধারণ ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই বর্ষার সময় জল ধরে রাখার পরিবর্তে ওই সব বাঁধ থেকে বাঁধ-কর্তৃপক্ষ জল ছাড়তে বাধ্য হন কারণ বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। বাঁধ বা জলাধার ভেঙে গেলে প্রলয়ংকরী বন্যা হতে পারে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বাঁধ ভেঙে বন্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচের সারণিতে দেখানো হল—

রাজ্য	বাঁধের নাম	বাঁধ ভাঙার বছর
মধ্যপ্রদেশ	কেদারনালা	1964
উত্তরপ্রদেশ	নানকসাগর	1967
কর্ণাটক	চিক্কাহোল	1972
তামিলনাড়ু	কোদানগর	1977
গুজরাট	মাচ্ছু-II	1979
গুজরাট	মিট্টী	1988

অনেক সময় দেখা যায় জলাধার তৈরির ফলে নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বন্যা হয়। 2000 সালে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার জন্য হয়েছিল। নিম্ন দামোদর অববাহিকায় বাঁধের জল ছাড়ার দরুন বন্যা প্রায় প্রতি বছরের রুটিন মাফিক ঘটনা। নিম্ন দামোদরে 1978 সালে এক মারাত্মক বন্যা ঘটেছিল। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসের 26 থেকে 29 তারিখ পর্যন্ত একটানা মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। এই বিপুল পরিমাণ জল জলাধারগুলিতে এসে জমা হয় ও বাঁধগুলিকে বিপন্ন করে তোলে। ফলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধগুলি থেকে জল ছাড়া শুরু হয়। নিম্ন দামোদর এলাকার নদীগুলি তখন এমনিতেই বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ছিল। বাঁধ থেকে ছাড়া অতিরিক্ত জলে সমগ্র নিম্ন দামোদর এলাকা ভেসে যায়। এর ফলে প্রায় প্রতি বছরই বহু লোক মারা যান এবং গবাদিপশু ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

অনুরূপভাবে মালদায় 1998 সালে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে প্রচুর জল ছেড়ে দেওয়ায় এবং অতিবৃষ্টির কারণে বিরাট বন্যা হয়। এই বন্যায় কোনো কোনো এলাকা একাদিক্রমে 10-15 দিন পর্যন্ত জলের তলায় চলে গেছিল।

(ii) নগরায়ণ : নদীর দুপাশে বসতি, কল-কারখানা গড়ে উঠলে কিংবা নদী উপত্যকায় চাষবাস শুরু হলে নদী স্বাভাবিক অবস্থায় যতদূর দুকূল ছাপিয়ে যেতে পারত তা বাধা প্রাপ্ত হবে। ফলে বর্ষার সময়ে নদী পলি জমা করে যে প্লাবন ভূমি তৈরি করতে পারত, তা আর হয় না। পলি নদীগর্ভে জমা পড়ে ও তা ভরাট করে বন্যার সৃষ্টি করে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদের বন্যা এ কারণে হয়।

(iii) **রুদ্ধ জলাশয় :** গ্রাম ও শহরের আশেপাশে জলাশয় ও জলাভূমিগুলি নির্বিচারে বুজিয়ে ফেলার জন্য বর্ষার জল ওই নীচু জমিতে জমার সুযোগ পায় না। ফলে বন্যা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খাল সংস্কার না করায় দক্ষিণ 24 পরগনার অনেক স্থানেই বন্যা হচ্ছে।

(iv) **বৃক্ষচ্ছেদন :** পাহাড়ি এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা*, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। ওই মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়ে। এজন্য নদীগর্ভ ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ে। এভাবে পলি পড়ে নদীখাত বুজে গেলে নদী বারবার সহসা গতি পরিবর্তন করে। উদ্ভিদের শিকড়গুলি মাটিকে ধরে রাখে। ফলে বৃষ্টির জল অনেকটা সময় ধরে চুঁইয়ে মাটির নীচে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করতে পারে। উদ্ভিদশূন্য পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টির জল ঢাল বেয়ে দ্রুত বেগে নীচের দিকে নেমে আসে, ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের তেমন একটা বৃদ্ধি হয় না।** উপরন্তু ভূমিক্ষয়ও বেশি হয়। ধসও নামে।

পরিবেশের ওপর বন্যার প্রভাব :

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে :—

- শস্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। শাকসবজি পচে যায়। ফলে মানুষ ও তৃণভোজী প্রাণীর খাবারে টান পড়ে।
- বন্যার স্রোতে কত পশু, মানুষ ভেসে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। বন্যার প্রকোপে বহু মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারায়।
- বন্যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পরিসেবা ব্যাহত হয়। রাস্তা ভেঙে যায়। রেললাইন ডুবে যায়। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা যায়। আন্ত্রিক, কলেরার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

---

* বৃক্ষের প্রকৃতির ওপর বৃষ্টির জলধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণত বড়ো বড়ো গাছ তাদের শেকড়ের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের মোট দুই-তৃতীয়াংশকে সঞ্চয় করে। সেই তুলনায় গুল্ম কিছুটা কম এবং ঘাস আরও কম জলধারণ করতে পারে। গাছ কাটার ফলে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ (infiltration) হ্রাস পায় ও পৃষ্ঠপ্রবাহ (surfacerun-off) বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাতের প্রায় 85% জল পাতলা পাতের (laminated flow) ন্যায় নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে নদীখাতের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত প্রবাহ বন্যার সৃষ্টি করে।

** অধিক ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে, যার ফলে নদীতে পলির পরিমাণ বাড়ে, নদীখাত ক্রমশ মজে যায় ও নদী-তলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এইসব কারণগুলির সম্মিলিত প্রভাবে কেবল বন্যাই সংঘটিত হয় না, বন্যার তীব্রতাও বাড়ে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে গত একশো বছরে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলিতে বন্যার সংখ্যা, বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে গঙ্গা সমভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও গঙ্গার উপনদীগুলিতে বন্যার প্রবণতা বেড়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্যা
(Floods)

বন্যা হল এক ক্রমান্বয়ী বায়ুমণ্ডলীয় দুর্যোগ যা আবহাওয়ার উপাদানগুলির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে দীর্ঘ সময়ভিত্তিক এক ক্রমান্বয়ী ফলাফল সৃষ্টি করে।

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যদিও তা সৃষ্টিতে মানুষেরও হাত রয়েছে। বন্যা কী? নদী যখন আগত জলরাশিকে তার গর্ভে ধরে রাখতে পারে না, তখন তা (River-bed) দুকূল ছাপিয়ে তীরবর্তী জনপদকে প্লাবিত করে।* একেই বন্যা বলে। Shakespeare তাঁর অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা-তে বন্যা ও মানুষের সম্পর্কের এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন।

They take the flow of the Nile

.....

The higher the Nilus Swells

The more the promises

---

* তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই বন্যা বলতে নদীসৃষ্ট বন্যার কথাই বোঝানো হয়ে থাকে, যদিও নদীর বন্যা ছাড়াও বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আরও সম্ভাবনা থাকে, যেমন জাপানে সাম্প্রতিককালে (মার্চ, 2011) সুনামির সময় ঘটে যাওয়া প্লাবন। ভেন্ টি চাউ (Ven te Chow, 1956) বন্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়েও নদীর সঙ্গে বন্যার সম্পর্ককেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে (A flood is a relatively high flow which overtakes the natural channel provided for the run off.)। বন্যা হল এমন এক বাড়তি জলের প্রবাহ যা স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য নির্দিষ্ট নদীখাতের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। রুজভেল্ট (Rostveldt) এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী (১৯৬৩) বন্যার সংজ্ঞাকে মানুষের বন্যারোধকারী চেষ্টা, কৃত্রিম প্রবাহপথ সৃষ্টি ইত্যাদির কথা মনে রেখে আরও বাস্তবসম্মত করতে চেয়েছেন : (''Flood is any high stream flow which over-tops natural on artificial banks of a stream.'')। বন্যা হল নদীর জলের এমন এক উচ্চমানের প্রবাহ যা নদীর প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পাড়গুলিকে ছাপিয়ে যায়। তবে এইসব সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার বাইরে সম্ভবত আর একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারের দিক দিয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞার প্রয়োজন। রয় ওয়ার্ড (Roy Ward, 1978) এই সাধারণ সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন : (A flood is a body of water which rises to overflow land which is not normally submerged.) বন্যা হল এমন এক জলপ্রবাহ যা নদীর পাড় ছাপিয়ে যায় এবং সাধারণত ডুবে যায় না এমন এলাকাকে প্লাবিত করে।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে কবি নীলনদের বন্যা ও মিশরবাসীদের তা থেকে উপকৃত হওয়ার যে দৃশ্য এঁকেছেন, আজকের মানুষ অনেকটা অজ্ঞতা ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে কথা মাথায় রাখে না। তাই অরণ্য ধ্বংস করে গড়ে ওঠে নতুন নতুন জনপদ ও কৃষিভূমি। শুরু হয় নদী উপত্যকা দখল। স্বাভাবিক কারণে নদীও তার আপন গতিপথ ফিরে পেতে চায়। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়, মানুষ ও নদীর মধ্যে এক যুদ্ধ। মানুষ চায় বাঁধ দিয়ে বন্যা ঠেকাতে, নদীর পাড় বেঁধে ভূমিক্ষয় রোধ করতে। কিন্তু মানুষের এই নদী শাসন খুব একটা ফলপ্রসূ হয় না। বরং বন্যার ভয়াবহতা বাড়ে, বাড়ে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি। এবার বন্যার কারণ নিয়ে আলোচনা করা যাক। বন্যার কারণ প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট, কিংবা উভয়বিধ হতে পারে। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হল—

বন্যাকে সাধারণত একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ পৃথিবীর কোনো নদীই এখন আর মানুষের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়, প্রায় সব নদীই নানাভাবে, কমবেশি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যা সৃষ্টিতে মানুষের ভূমিকা পরোক্ষ হলেও অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে মানুষের দ্বারা বন্যা হয়ে থাকে।

এ ছাড়া বন্যাকে বিপর্যয় বলা যায় কি না তা নিয়েও বিতর্ক আছে। পৃথিবীর অনেকগুলি অঞ্চল বেশি মাত্রায় বন্যাপ্রবণ যেমন গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপির বদ্বীপ, চিনের হোয়াংহো উপত্যকা, নিম্ন দামোদর উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গাঙ্গেয় সমভূমি, মায়ানমারের ইরাবতী, পাকিস্তানের সিন্ধু, আফ্রিকার নাইজার বদ্বীপ প্রভৃতি। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটিই ঘন বসতিযুক্ত এলাকা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধ কৃষি অর্থনীতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে। সুতরাং বন্যাকে কোটি কোটি মানুষ মেনে নিয়ে এইসব এলাকায় বাস করছেন ও জীবনধারণের উপযোগী কাজ খুঁজে পেয়েছেন। যে প্রাকৃতিক বিষয়কে স্থানীয় মানুষ বিপদ হিসাবে গণ্য করে না, সেটিকে দুর্ঘটনা বলা যায় না।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে নদী প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকার করে চলেছে। আমরা জানি যে, 'মিশর নীল নদের দান'। কারণ নীল নদের প্লাবিত জলে প্রতি বছর যে বন্যা হত, তার মাধ্যমেই এই মরুপ্রায় দেশে পলল সঞ্চিত হত। বন্যার দান এই পলিমাটি সে দেশের মানুষের জীবন ও অর্থনীতির উন্নতির মূলে রয়েছে। সুতরাং দুর্যোগ নয়, প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বন্যাকে 'সম্পদ' হিসাবে দেখে এসেছে। নদীর রোষ ও স্নিগ্ধতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নদীর জলের বাড়া-কমার সঙ্গে নিজের জীবনের ছন্দকে মিলিয়ে নদীর পাশে বসবাস করছে।

তুলনীয়— নদীর পাড়ে যাদের বাস, / ভাবনা তাদের বারোমাস।

বন্যার কারণ (Causes of Floods)

বন্যার কারণগুলি লক্ষ করলে বোঝা যায় তাদের মধ্যে কতকগুলি জলবায়ু ও আংশিকভাবে অন্য কোনো কারণের সঙ্গে যুক্ত। এ ছাড়াও জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, এমন কারণেও বন্যা হতে পারে। এই কারণগুলিকে নিম্নোক্ত সারণিতে দেখানো হল।

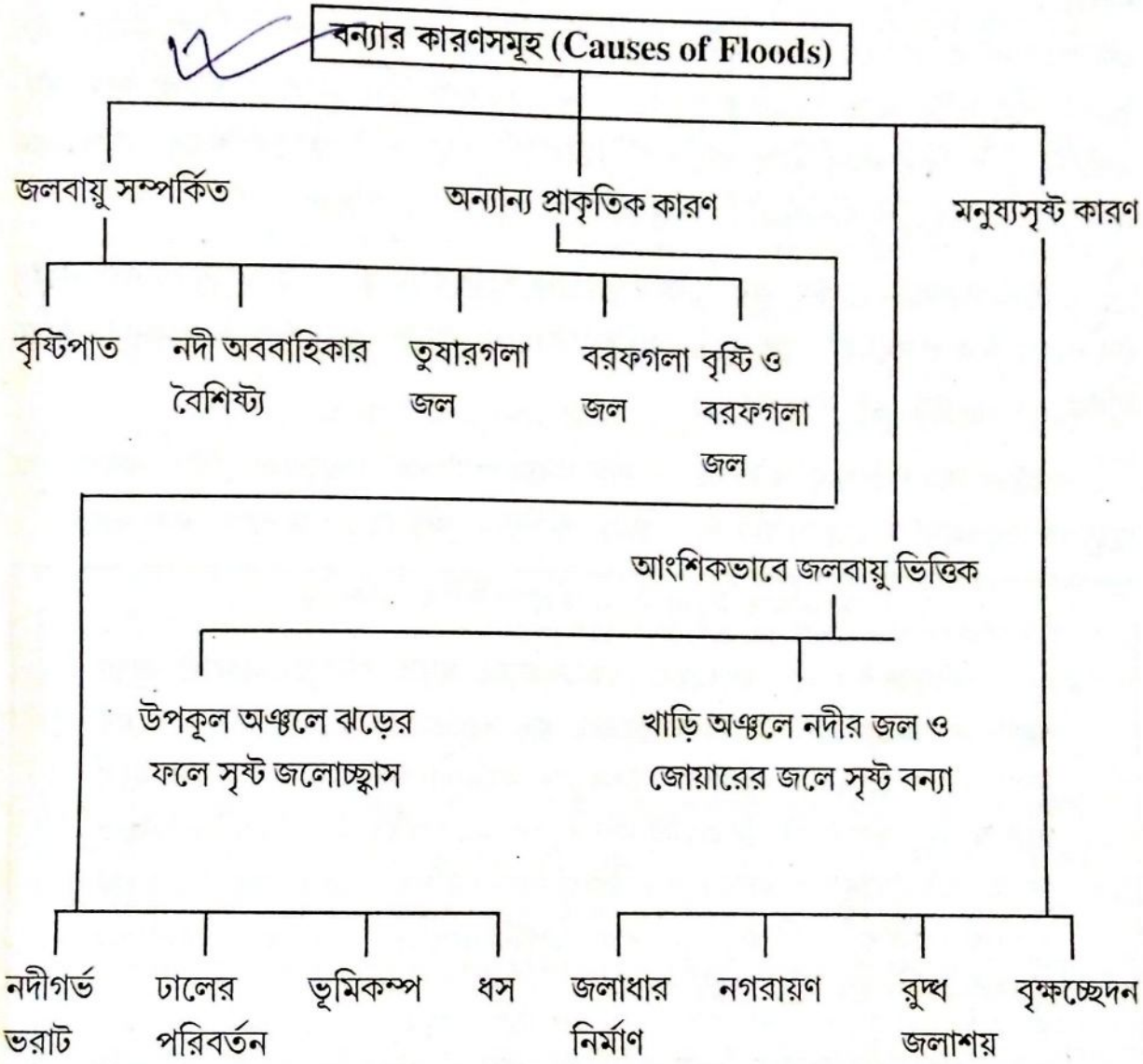

১। জলবায়ু সম্পর্কিত কারণ

বৃষ্টিপাত

কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা যথেষ্ট বেশি হলে সেখানে বন্যা হয়। এ প্রসঙ্গে 1999 সালের জলপাইগুড়ি শহরের বন্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই বছরের 9 জুলাই একদিনে জলপাইগুড়ি শহরে 474 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল যা বিগত

বছরের রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। উল্লেখ্য 8 জুলাই, 1892 সালে জলপাইগুড়িতে 391 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। একদিনের অতিবর্ষণ যে ওই শহরে বন্যার অন্যতম কারণ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মোদ্দাকথা, বছরের কোনো এক সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশি হলে বড়ো নদীতেও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোটো নদীর ক্ষেত্রে খুবই অল্প সময়ের ঝড়-বৃষ্টি থেকেও বন্যা হতে পারে। বেশি বৃষ্টির সময়ে বাষ্পীভবন ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে মাটির মধ্যে অনেক জল থেকে যাওয়ায় বাড়তি জল নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। একটানা বেশ কিছু সময় ধরে সমহারে বৃষ্টিপাতও বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। কোলম্যান (Colman, 1953) বৃষ্টিপাতজনিত বন্যাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন*।

দীর্ঘকালস্থায়ী বৃষ্টির কারণে বন্যা (Long rain flood) : এই ধরনের বন্যার কারণ হল কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ জুড়ে প্রায় সমহারে কম তীব্রতাযুক্ত বৃষ্টিপাত। সাধারণত বড়ো ঘূর্ণিঝড়ের সাহায্যে এই বন্যা হয়।

হড়কা বান (Flash Flood) : এই বন্যা সাধারণত পরিচলন বৃষ্টির সাহায্যে বা বায়ুমণ্ডলে কোনো সীমান্ত সৃষ্টির ফলে হওয়া অবিরাম বৃষ্টিপাতের সাহায্যে হয়ে থাকে।

মহানন্দার হড়কা বানে ভাসতে পারে শিলিগুড়ি

মহানন্দার হড়কা বানে এবার ভেসে যেতে পারে শিলিগুড়ি শহরের বড়ো অংশ। এ বছরও হিলকার্ট রোড পুরোটা যান চলাচলের উপযুক্ত হবে না। এর কারণ, পাগলাঝোরায় মহানন্দার উৎসমুখে বড়োমাপের জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে। এই জলাধারটি যদি এখনই নষ্ট না করা হয় তাহলে 1968 সালের তিস্তার বন্যার মতো মহানন্দাও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। রবিবার এক প্রশ্নের উত্তরে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগের প্রতিনিধিদলের অধ্যাপক সুবীর সরকার।

শিলিগুড়ির ফুসফুস হিসেবে চিহ্নিত মহানন্দা নদী সৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ি শহর থেকে প্রায় 37 কিলোমিটার দূরে শিলিগুড়ি-কার্সিয়াং রুটের হিলকার্ট রোডের শিবখোলা বন থেকে। বাবুখোলা, পাগলাঝোরা ও শিবখোলার জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহানন্দা। মূলত ওই 3টি পাহাড়ি ঝোরার মিলনস্থল থেকে প্রায় 500 ফুট

* ল্যামবার্ট (Lambert 1956) বন্যার যে সাতটি ভাগ করেছেন তার মধ্যে তিনটি বৃষ্টিপাতজনিত। এগুলি হল যথাক্রমে : স্থানীয় পরিচলন বৃষ্টি ; ঘূর্ণ বৃষ্টি ; পার্বত্য এলাকার প্রভাবে শক্তিবৃদ্ধি পাওয়া ঘূর্ণ বৃষ্টি। তবে এই শ্রেণিবিভাগের সাহায্যে সবরকম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাকে যুক্ত করা যায়নি। বৃষ্টিপাতজনিত বন্যা পৃথিবীর প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়।

উঁচুতে রয়েছে হিলকার্ট রোডের লোয়ার পাগলাঝোরা এলাকা। 2010 সালের 16 জুনের বড়ো মাপের ধসের কারণে হিলকার্ট রোডের পাগলাঝোরা দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ পাগলাঝোরায় সড়ক মেরামতের কাজ করছে। কিন্তু এ বছরও এই রুটে যান চলাচল করবে কি না তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। কারণ যেভাবে ধস মেরামতের কাজ চলছে তা ক্ষতির তুলনায় উপযুক্ত নয়। এই এলাকার হিলকার্ট রোড ঠিক না হলে নিউ জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং রুটে ট্রেনও চলবে না। পর্যটনেরও ক্ষতি হবে।

ধসের কারণ খুঁজতেই মূলত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের 4 ছাত্র সহ 8 সদস্যের একটি গবেষকদল অধ্যাপক ইন্দিরা লেপচার নেতৃত্বে শিবখোলা বনের মহানন্দার উৎসমুখে গবেষণা এবং অনুসন্ধান চালান। এই দলের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন অধ্যাপক ইন্দিরা লেপচা ছাড়াও অধ্যাপক পি কে মণ্ডল এবং অধ্যাপক সুবীর সরকার।

এই গবেষকদলটি মহানন্দার উৎসমুখে লক্ষ করেন, একটি জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবেই। এই জলাধার সৃষ্টির কারণ, ধসের আবর্জনা। ধসের আবর্জনা সোজা নীচে ফেলা হয়েছে এতদিন। এই আবর্জনা পড়েছে ত্রিধারায় (বাবুখোলা, শিবখোলা এবং পাগলাঝোরা) দোভান (মিলনস্থল/মহানন্দার উৎসমুখে) বক্ষে। সেখানে প্রায় 4 হাজার বর্গফুটের জলাধার তৈরি হয়ে রয়েছে। এই জলাধারে কমপক্ষে এখন এক লক্ষ ঘনফুট জল জমে রয়েছে। বর্তমানে শুধুমাত্র পাগলাঝোরাতেই জল রয়েছে। অন্য দুটি ঝোরা শুকনো। বর্ষা এখনও শুরু হয়নি।

এই জলাধারের বিপদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে গবেষকদলের সদস্য অধ্যাপক সুবীর সরকার জানান, এই জলাধারটিই বিপদ ডেকে আনতে পারে। বর্ষার সময় জলরাশি আরও বেড়ে যাবে। জলের চাপ বাড়বে। হঠাৎ করে বর্ষার সময় যদি এই জলাধার ভেঙে যায় তাহলে মহানন্দায় হড়কা বান দেখা দেবে। এমনটা হলে হিলকার্ট রোড দিয়ে ৬/৭ ফুট জল প্রবাহিত হতে পারে। ১৯৬৮ সালের তিস্তা যেমনটা ঘটিয়েছিল জলপাইগুড়িতে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে সুবীরবাবু জানান, ওই জলাধারটি এখুনি যদি নষ্ট না করা যায় তাহলে বিপদ ঘটবে। শিলিগুড়িকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে হলে ওই জলাধারটি এখনই ভেঙে দিতে বড়ো বড়ো পাথর ভেঙে ফেলতে হবে।

এক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সুবীর সরকার জানান, ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত ধস হচ্ছে। কারণ মাটি ঝুরঝুরে। তা ছাড়া যেভাবে ধস মোকাবিলায় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কাজ করছে তা উপযুক্ত নয়। এর ফলে নদীগর্ভে আবর্জনা বেশি করে জমা

হচ্ছে। ওখানে স্টীল ফ্রেম ও কংক্রিটের ঢালাই করে ধস মোকাবিলায় গার্ডওয়াল ইত্যাদি নির্মাণ করা অত্যন্ত জরুরি। উপযুক্ত পদ্ধতিতে কাজ না হলে প্রতিবছর ধস হবে, দোভানে আবর্জনা জমবে। শিলিগুড়ি বিপদের মুখে চলে আসতে পারে। বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের জরুরিভিত্তিক চিন্তাভাবনা করা উচিত।

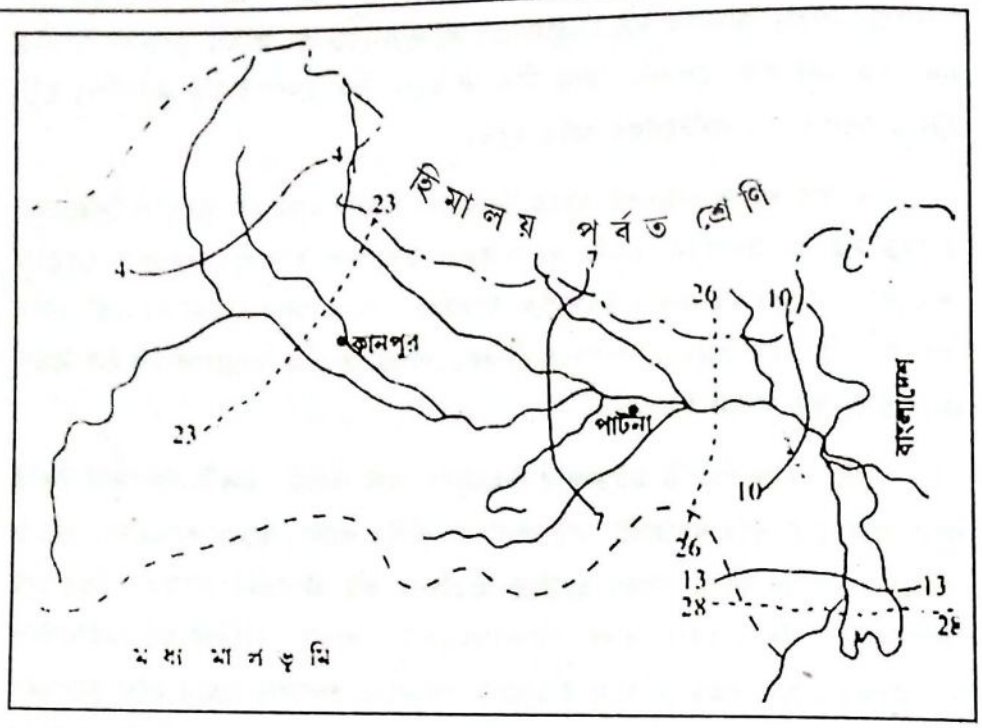

চিত্র 3 ঃ 1978-এর বন্যার সেপ্টেম্বর মাসের দিনভিত্তিক অগ্রগতি

দীর্ঘমেয়াদি বন্যার উদাহরণ 1978 সালে গঙ্গা অববাহিকার উচ্চগতি থেকে নিম্নগতি পর্যন্ত বিভিন্ন অংশের বন্যার অগ্রগতি সমতারিখ (isodate) রেখা দ্বারা চিত্রে দেখানো হয়েছে। ওই বছর 1, 2 এবং 3 সেপ্টেম্বর তারিখে যমুনা নদীর ধারণ-অববাহিকা অঞ্চলে নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতে যমুনানদীর দু'কূল উপচে জল প্রবাহিত হয় এবং 4 সেপ্টেম্বর দিল্লি শহর প্লাবিত হয়। ধীরে ধীরে বন্যার জল অববাহিকার নীচের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ফলে মথুরা, বৃন্দাবন ও আগ্রা একের পর এক প্লাবিত হয়ে যায়। 7 সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ ও বারাণসী বিপদসীমার কাছে চলে আসে। কিন্তু দিল্লিতে জলের স্তর নেমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। 10 সেপ্টেম্বর বারাণসী থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি প্লাবিত হয়। 11 সেপ্টেম্বর এই জলপ্রবাহ রাজমহল পাহাড় অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই অববাহিকা অঞ্চল পুনরায় প্লাবিত হয় যা বিন্দু রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। 22 সেপ্টেম্বর দিল্লি, আগ্রা, মথুরা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলতল বিপদসীমা অতিক্রম করে। 26 তারিখের মধ্যে বিহার পর্যন্ত গঙ্গার জলতল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর প্রধান কারণ হল অববাহিকার উচ্চ অংশ থেকে জলের আগমন।

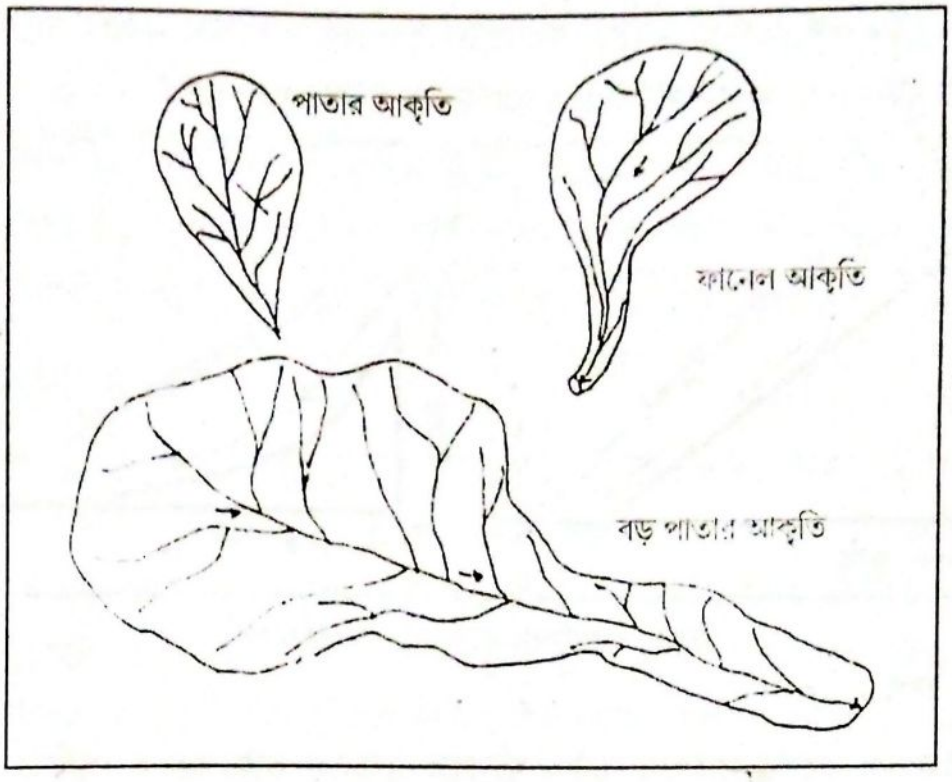

চিত্র 4 ঃ বিভিন্ন প্রকার নদী অববাহিকা

নদী অববাহিকার বৈশিষ্ট্য ও বন্যা :

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নদী অববাহিকা ও বন্যার মধ্যে সম্পর্কের কথা চলে আসে। এ প্রসঙ্গে নদী অববাহিকার আকৃতি, রৈখিক বৈশিষ্ট্য ও ক্ষেত্রফলের সঙ্গে বন্যার সম্পর্কের কথা স্বভাবতই মনে আসে। আমরা জানি নদী অববাহিকার বিভিন্নাকৃতি নদীতে বন্যা তথা জল সরবরাহের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। ''The shape of the drainage basin mainly governs the rate at which water is supplied to the main stream as it proceeds along its course from the source to the mouth.'' উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, পাতার আকৃতি অববাহিকা (leaf shaped basin) কিংবা ফাঁদল (funnel) আকৃতির অববাহিকার তুলনায় বাঁধাকপি আকৃতির (Cauliflower) অববাহিকায় জল নিষ্কাশন তাড়াতাড়ি হয়। গঙ্গানদীর অববাহিকার আকৃতি ছড়ানো ছিটানো। এখানে গঙ্গার উচ্চগতিতে যদি বন্যা হয় তবে ওই জল পশ্চিমবঙ্গে নামতে কয়েক দিন লাগবে। সেই তুলনায় দার্জিলিং জেলার বালাসন নদীর উচ্চগতিতে যদি বন্যা হয় তবে তার জল মোটামুটি পরের দিনই শিলিগুড়িতে নামবে। কারণ বালাসন নদীর অববাহিকা অনেকটা পাতার মতো (leaf shaped)। নদী অববাহিকার ঢালের কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে, কারণ খাড়াই ঢালে জল নিষ্কাশন তাড়াতাড়ি হয়। ফলে উচ্চগতি থেকে বন্যার জল সহজেই নীচে নেমে এসে সমতলের বিস্তীর্ণ

এলাকাকে শীঘ্রই বন্যাপ্লাবিত করে। পক্ষান্তরে মৃদু ঢালু এলাকায় বন্যার প্রকোপ ততটা ক্ষতিকারক হয় না বা আগাম সর্তকতা পেলে মানুষ সর্তক হতে পারে।

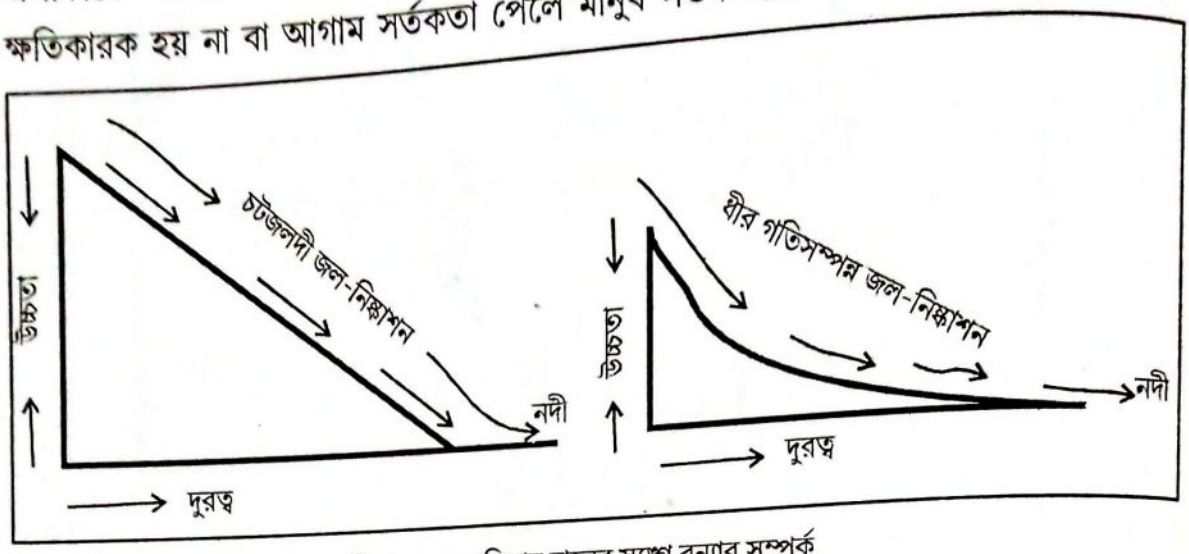

চিত্র 5 ঃ অববাহিকার ঢালের সঙ্গে বন্যার সম্পর্ক

বরফগলা জল :

বরফগলা জলের সাহায্যে বন্যার ঘটনাকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি : একটি হল (1) প্রায় চিরস্থায়ী মহাদেশীয় বরফের স্তরের অবস্থা সংক্রান্ত ও উপত্যকার হিমবাহের প্রভাব সংক্রান্ত এবং আর একটি হল (2) কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে নদীর জল জমে যাওয়া ও পরবর্তী ঋতুতে তার গলন। বরফ সাধারণত তুষারের তুলনায় অনেক ধীরে ধীরে গলে। তাই কেবলমাত্র বরফগলা জলের কারণে ভয়ংকর বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা কম। হিমবাহ অধ্যুষিত অঞ্চলের নদীগুলির জলপ্রবাহের পরিবর্তন লক্ষ করলে বোঝা যায়, এইসব নদীতে শীতকালে জলের পরিমাণ খুবই কম থাকে। কিন্তু মে থেকে জুলাই বা আগস্ট মাস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জলের প্রবাহ হঠাৎ খুব বেড়ে যায়।* শুধুমাত্র বরফগলা জলের সাহায্যে সবসময়ে বন্যা না হলেও পরোক্ষভাবে বরফগলা জল বা বরফের স্তূপ গলে যাওয়ার কারণে বন্যা হতে পারে। হিমবাহ সাময়িকভাবে এগিয়ে এসে অনেকসময় নদীতে বাধার সৃষ্টি করে ও বন্যা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

তুষারগলা জল :

বৃষ্টির জল ছাড়াও তুষার গলা জলও বন্যার কারণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশে এই কারণে বন্যা হয়। উচ্চ অক্ষাংশের ওই সব দেশগুলিতে খুব বেশি তুষারপাত হয়। ফলে সেখানে দীর্ঘ শীতকালের পরে যখন হঠাৎ তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় ও কয়েক সপ্তাহ ধরে বেশি উষ্ণতা থাকে, তখন সেখানে এই ধরনের

* ফরাসি নদীবিজ্ঞানী M. Parde নদীবর্তন (River Regime)-এর এই ধরনের ধাপকে Simple Regime বা সরল নদীবর্তন বলেছেন।

বন্যার সম্ভাবনা থাকে। ফন্ বা চিনুকজাতীয় স্থানীয় বায়ুর ভূমিকা এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য হয়। এধরনের বন্যা নদীর নিম্নপ্রবাহের সমভূমি অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়। ইগার্কা এলাকায় ইনিসি নদীর নিম্নপ্রবাহে জুন মাসের গড় প্রবাহ 78,550 কিউসেকের (cf/s) মতো। শুধুমাত্র আমাজন নদীতে এর চেয়ে বেশি জল দেখা যায়। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ফ্রেজার নদীতে 1948 সালের তুষারগলা জলের বন্যা এই জাতীয় বন্যার একটি উদাহরণ (রয় ওয়ার্ড, 1978)।

বৃষ্টি ও বরফগলা জল :

বৃষ্টি ও বরফগলা জলের মিলিত প্রভাবের ফলে বন্যা হতে পারে। এই জাতীয় বন্যার ক্ষেত্রে জলের দুটি উৎস থাকায় সহজে জল বেড়ে যায়। উচ্চ অক্ষাংশে বৃষ্টিপাতের অনেকটাই তুষারের আকারে জমা হয়। লক্ষ করে দেখা গেছে যে, 30 সেন্টিমিটার গভীর একটি তুষারের স্তর অনায়াসেই একটি বড়ো ধরনের বৃষ্টিপাতকে শুষে নিতে পারে যা পরবর্তীতে হঠাৎ খুব বেশি পরিমাণে জল তৈরি করে বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। সাধারণ বন্যার তুলনায় এজাতীয় বন্যায় প্রায় ৩৫ শতাংশ বেশি জলপ্রবাহ লক্ষ করা যায়।

২। আংশিকভাবে জলবায়ু ভিত্তিক :

উপকূল অঞ্চলে ঝড়ের ফলে জলোচ্ছ্বাস :

মুক্ত উপকূল অঞ্চলে জোয়ারভাটার প্রভাবে প্রতিদিনই জল ওঠা-নামা করে কিন্তু ঝড়ের সময়ে এই সাধারণ ওঠা-নামার তুলনায় সমুদ্রের জলে বেশি স্ফীতি ঘটে এবং উপকূল অঞ্চলে বন্যার সৃষ্টি হয়। ঝড়ের গতিবেগের ওপর এই জলস্ফীতি নির্ভর করে। নিম্ন অক্ষাংশের সমুদ্রে সৃষ্ট ক্রান্তীয় ঘূর্ণিবায়ুর ফলে হারিকেনজাতীয় ঝড় তৈরি হয়। এই হ্যারিকেন, টাইফুন এবং তাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন আরও কিছু ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত উপকূল অঞ্চলে বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। ঘণ্টায় 120 কিলোমিটার থেকে 300 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবল বাতাসের ফলে সমুদ্রজল খুব বেশি উঁচু হয়ে ওঠে। সমুদ্রতলে স্বাভাবিক বায়ুচাপের পরিমাণ হল 1013.20 মিলিবার। লুজন-এ 1927 সালে একটি টাইফুনে সর্বনিম্ন কেন্দ্রীয় বায়ুচাপের পরিমাণ ছিল 886.56 মিলিবার। ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় 126.6 মিলিবার বায়ুচাপের পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বেড়ে দাঁড়ায় 131 সেন্টিমিটার। স্মরণকালের মধ্যে বাংলাদেশে 1970 সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট এক ঘূর্ণিঝড়ে 3 লক্ষ লোক মারা যায় এবং 750 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে 20 লক্ষ লোক কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খাড়ি অঞ্চলে নদীর জল ও জোয়ারের জলে সৃষ্ট বন্যা

অনেক সময় খাড়ি অঞ্চলে নদীর জল এবং সমুদ্রের জলের মিলিত প্রভাবে বন্যা সৃষ্টি হয়। খাড়িতে এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তার বেশিরভাগ সময়েই জোয়ারের জলের সঙ্গে নদীর জলের মিশ্রণের ফলে ওই জলতল বন্যা সৃষ্টির মতো বিশেষ অবস্থায় পৌঁছায়। বলা হয়ে থাকে যে ভরা কোটালের সময়ে জোয়ারের জল এত বেড়ে যায় যে নদীর জলের পরিমাণ কম থাকলেও ওই সম্মিলিত জলকে (মরা কোটাল ও নদীর জল) নদীখাতে ধরে রাখতে পারে না। আবার মরা কোটালের সময়ে যদি নদীর জলের পরিমাণ খুব বেশি থাকে তাহলেও উভয় জলে (মরা কোটাল ও নদীর জল) বন্যা হতে পারে।

৩। অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণ :

নদীগর্ভ ভরাট

নদীগর্ভ ভরাট হয়ে গেলে নদীর জলবহন ক্ষমতা কমে যায়। ক্রমাগত নদীর পাড় ভেঙে গেলে নদীতে পলি জমা হয়। তা ছাড়া, নিম্নগতিতে বহন ক্ষমতা কমে যাওয়ার দরুন নদীগর্ভেই পলি জমা হতে থাকে। ফলে একটু বেশি বৃষ্টি হলেই নদী দুকূল ছাপিয়ে চারদিক জলমগ্ন করে বন্যা সৃষ্টি করে। দক্ষিণবঙ্গের নদীগুলিতে এই কারণেই বন্যা হয়।

ঢালের পরিবর্তন

পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নামার সময় পর্বতের পাদদেশ (foot-hill) অঞ্চলে নদীর ঢালের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে। ফলে পাহাড় থেকে আসা পলি নদীগর্ভেই পাদদেশ অঞ্চলে জমা হয়। নদীগর্ভ ভরাট হওয়ার দরুন উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়।

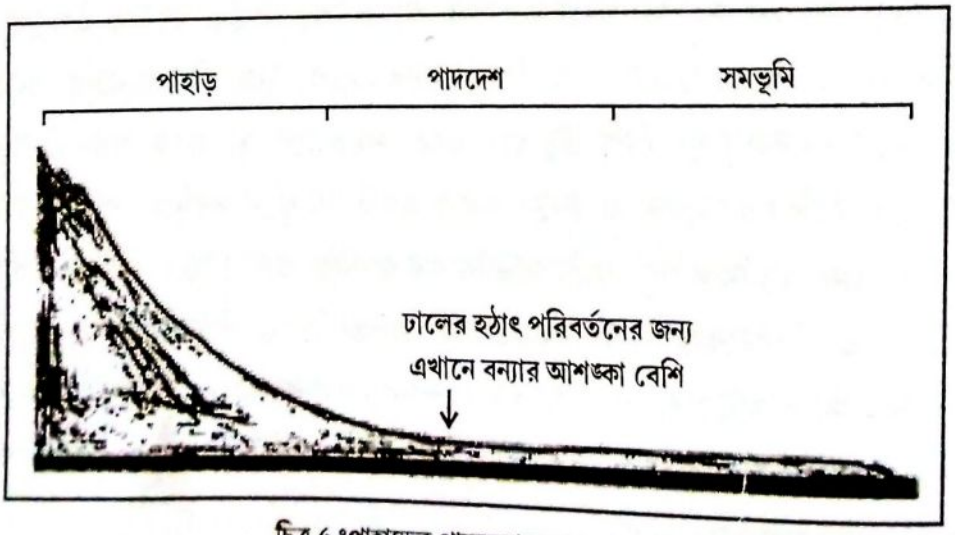

চিত্র ৬ ঃপাহাড়ের পাদদেশে বন্যার কারণ

ধস :

অনেক সময় দেখা গেছে পাহাড়ে ধস নামলে ও একটি বড়ো পাথরের টুকরো নদীগর্ভে পড়লে নদীর স্বাভাবিকগতি বন্ধ হয়ে যায় ও আপনা আপনি প্রাকৃতিক জলাধার তৈরি হয়। এরপর প্রবল চাপে যখন ওই বাধা (পাথরের টুকরো) সরে যায়, তখন প্রচুর পরিমাণে আবদ্ধ জল সমতলে নেমে এসে নদীর দুকূল প্লাবিত করে।

প্রাকৃতিক জলাধারের ভাঙনে বন্যা	
নদী	বছর
সিন্ধু	1841 ও 1858
বিরেগঙ্গা	1893
ভাগীরথী	1978
মালিপাগড় ও কালি	1998
সায়ক	1926 ও 1929
অলকানন্দা	1970
শতদ্রু ও বাগমতী	1993

নদীর গতিপথে যদি প্রচুর বাঁক থাকে তবে জলের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। ফলে নদীর প্রবাহিত জল সহজে নিষ্কাশিত (Drain) হতে পারে না, তখন অতিরিক্ত জলপ্রবাহ (discharge) নদীর দু'পাড় ছাপিয়ে প্লাবন ঘটায়।

ভূমিকম্প :

অনেক সময় ভূমিকম্পও বন্যার কারণ হতে পারে। 1988 সালের 20 আগস্ট বিহারের কোশী ও কমলা বালান নদী বরাবর নির্মিত বাঁধে ভূমিকম্পের ফলে বন্যার সৃষ্টি হয় এবং মধুবনী জেলার 50টি গ্রাম ও মুঙ্গের জেলার 30টি গ্রাম জলমগ্ন হয়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণ :

(i) **জলাধার নির্মাণ :** বহুমুখী নদী পরিকল্পনায় নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। এতে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম জলাধার তৈরি করা হয়। তাতে ফি-বছর পলি জমতে থাকে।* ফলে বাঁধের

* পরবর্তী (তৃতীয়) অধ্যায়ে আমরা দেখব দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনায় (DVC) যেসব জলাধার (পাঞ্চেৎ, মাইথন, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী) নির্মাণ করা হয়েছিল, তাতে কী বিপজ্জনক হারে পলি জমছে ও সেগুলির জলধারণ ক্ষমতা কত কমে গেছে।

জলধারণ ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। তাই বর্ষার সময় জল ধরে রাখার পরিবর্তে ওই সব বাঁধ থেকে বাঁধ-কর্তৃপক্ষ জল ছাড়তে বাধ্য হন কারণ বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। বাঁধ বা জলাধার ভেঙে গেলে প্রলয়ংকরী বন্যা হতে পারে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বাঁধ ভেঙে বন্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচের সারণিতে দেখানো হল—

রাজ্য	বাঁধের নাম	বাঁধ ভাঙার বছর
মধ্যপ্রদেশ	কেদারনালা	1964
উত্তরপ্রদেশ	নানকসাগর	1967
কর্ণাটক	চিক্কাহোল	1972
তামিলনাড়ু	কোদানগর	1977
গুজরাট	মাচ্ছু-II	1979
গুজরাট	মিট্টী	1988

অনেক সময় দেখা যায় জলাধার তৈরির ফলে নদীর উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বন্যা হয়। 2000 সালে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা ময়ূরাক্ষী জলাধার থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার জন্য হয়েছিল। নিম্ন দামোদর অববাহিকায় বাঁধের জল ছাড়ার দরুন বন্যা প্রায় প্রতি বছরের রুটিন মাফিক ঘটনা। নিম্ন দামোদরে 1978 সালে এক মারাত্মক বন্যা ঘটেছিল। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসের 26 থেকে 29 তারিখ পর্যন্ত একটানা মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে। এই বিপুল পরিমাণ জল জলাধারগুলিতে এসে জমা হয় ও বাঁধগুলিকে বিপন্ন করে তোলে। ফলে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধগুলি থেকে জল ছাড়া শুরু হয়। নিম্ন দামোদর এলাকার নদীগুলি তখন এমনিতেই বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে ছিল। বাঁধ থেকে ছাড়া অতিরিক্ত জলে সমগ্র নিম্ন দামোদর এলাকা ভেসে যায়। এর ফলে প্রায় প্রতি বছরই বহু লোক মারা যান এবং গবাদিপশু ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়।

অনুরূপভাবে মালদায় 1998 সালে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে প্রচুর জল ছেড়ে দেওয়ায় এবং অতিবৃষ্টির কারণে বিরাট বন্যা হয়। এই বন্যায় কোনো কোনো এলাকা একাদিক্রমে 10-15 দিন পর্যন্ত জলের তলায় চলে গেছিল।

(ii) নগরায়ণ : নদীর দুপাশে বসতি, কল-কারখানা গড়ে উঠলে কিংবা নদী উপত্যকায় চাষবাস শুরু হলে নদী স্বাভাবিক অবস্থায় যতদূর দুকূল ছাপিয়ে যেতে পারত তা বাধা প্রাপ্ত হবে। ফলে বর্ষার সময়ে নদী পলি জমা করে যে প্লাবন ভূমি তৈরি করতে পারত, তা আর হয় না। পলি নদীগর্ভে জমা পড়ে ও তা ভরাট করে বন্যার সৃষ্টি করে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদের বন্যা এ কারণে হয়।

(iii) **রুদ্ধ জলাশয় :** গ্রাম ও শহরের আশেপাশে জলাশয় ও জলাভূমিগুলি নির্বিচারে বুজিয়ে ফেলার জন্য বর্ষার জল ওই নীচু জমিতে জমার সুযোগ পায় না। ফলে বন্যা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খাল সংস্কার না করায় দক্ষিণ 24 পরগনার অনেক স্থানেই বন্যা হচ্ছে।

(iv) **বৃক্ষচ্ছেদন :** পাহাড়ি এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা*, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। ওই মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়ে। এজন্য নদীগর্ভ ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ে। এভাবে পলি পড়ে নদীখাত বুজে গেলে নদী বারবার সহসা গতি পরিবর্তন করে। উদ্ভিদের শিকড়গুলি মাটিকে ধরে রাখে। ফলে বৃষ্টির জল অনেকটা সময় ধরে চুঁইয়ে মাটির নীচে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করতে পারে। উদ্ভিদশূন্য পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টির জল ঢাল বেয়ে দ্রুত বেগে নীচের দিকে নেমে আসে, ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের তেমন একটা বৃদ্ধি হয় না।** উপরন্তু ভূমিক্ষয়ও বেশি হয়। ধসও নামে।

পরিবেশের ওপর বন্যার প্রভাব :

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে :—

- শস্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। শাকসবজি পচে যায়। ফলে মানুষ ও তৃণভোজী প্রাণীর খাবারে টান পড়ে।
- বন্যার স্রোতে কত পশু, মানুষ ভেসে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। বন্যার প্রকোপে বহু মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারায়।
- বন্যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পরিসেবা ব্যাহত হয়। রাস্তা ভেঙে যায়। রেললাইন ডুবে যায়। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা যায়। আন্ত্রিক, কলেরার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

---

* বৃক্ষের প্রকৃতির ওপর বৃষ্টির জলধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণত বড়ো বড়ো গাছ তাদের শেকড়ের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের মোট দুই-তৃতীয়াংশকে সঞ্চয় করে। সেই তুলনায় গুল্ম কিছুটা কম এবং ঘাস আরও কম জলধারণ করতে পারে। গাছ কাটার ফলে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ (infiltration) হ্রাস পায় ও পৃষ্ঠপ্রবাহ (surfacerun-off) বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাতের প্রায় 85% জল পাতলা পাতের (laminated flow) ন্যায় নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে নদীখাতের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত প্রবাহ বন্যার সৃষ্টি করে।

** অধিক ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে, যার ফলে নদীতে পলির পরিমাণ বাড়ে, নদীখাত ক্রমশ মজে যায় ও নদী-তলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এইসব কারণগুলির সম্মিলিত প্রভাবে কেবল বন্যাই সংঘটিত হয় না, বন্যার তীব্রতাও বাড়ে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে গত একশো বছরে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলিতে বন্যার সংখ্যা, বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে গঙ্গা সমভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও গঙ্গার উপনদীগুলিতে বন্যার প্রবণতা বেড়েছে।

(iii) **রুদ্ধ জলাশয় :** গ্রাম ও শহরের আশেপাশে জলাশয় ও জলাভূমিগুলি নির্বিচারে বুজিয়ে ফেলার জন্য বর্ষার জল ওই নীচু জমিতে জমার সুযোগ পায় না। ফলে বন্যা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় কলকাতার পূর্বদিকের জলাভূমি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খাল সংস্কার না করায় দক্ষিণ 24 পরগনার অনেক স্থানেই বন্যা হচ্ছে।

(iv) **বৃক্ষচ্ছেদন :** পাহাড়ি এলাকায় নির্বিচারে গাছ কাটা*, অনিয়ন্ত্রিত পশুচারণ, অবৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় হচ্ছে। ওই মাটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়ে। এজন্য নদীগর্ভ ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ে। এভাবে পলি পড়ে নদীখাত বুজে গেলে নদী বারবার সহসা গতি পরিবর্তন করে। উদ্ভিদের শিকড়গুলি মাটিকে ধরে রাখে। ফলে বৃষ্টির জল অনেকটা সময় ধরে চুঁইয়ে মাটির নীচে ভূগর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করতে পারে। উদ্ভিদশূন্য পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টির জল ঢাল বেয়ে দ্রুত বেগে নীচের দিকে নেমে আসে, ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের তেমন একটা বৃদ্ধি হয় না।** উপরন্তু ভূমিক্ষয়ও বেশি হয়। ধসও নামে।

পরিবেশের ওপর বন্যার প্রভাব :

বন্যা একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে :—

- শস্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। শাকসবজি পচে যায়। ফলে মানুষ ও তৃণভোজী প্রাণীর খাবারে টান পড়ে।
- বন্যার স্রোতে কত পশু, মানুষ ভেসে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। বন্যার প্রকোপে বহু মানুষ তাদের ঘরবাড়ি হারায়।
- বন্যার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পরিসেবা ব্যাহত হয়। রাস্তা ভেঙে যায়। রেললাইন ডুবে যায়। পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা যায়। আন্ত্রিক, কলেরার মতো রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

---

* বৃক্ষের প্রকৃতির ওপর বৃষ্টির জলধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণত বড়ো বড়ো গাছ তাদের শেকড়ের সাহায্যে বৃষ্টিপাতের মোট দুই-তৃতীয়াংশকে সঞ্চয় করে। সেই তুলনায় গুল্ম কিছুটা কম এবং ঘাস আরও কম জলধারণ করতে পারে। গাছ কাটার ফলে মাটিতে জলের অনুপ্রবেশ (infiltration) হ্রাস পায় ও পৃষ্ঠপ্রবাহ (surfacerun-off) বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাতের প্রায় 85% জল পাতলা পাতের (laminated flow) ন্যায় নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর ফলে নদীখাতের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত প্রবাহ বন্যার সৃষ্টি করে।

** অধিক ভূপৃষ্ঠপ্রবাহ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে, যার ফলে নদীতে পলির পরিমাণ বাড়ে, নদীখাত ক্রমশ মজে যায় ও নদী-তলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। এইসব কারণগুলির সম্মিলিত প্রভাবে কেবল বন্যাই সংঘটিত হয় না, বন্যার তীব্রতাও বাড়ে। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে গত একশো বছরে ব্যাপক বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে হিমালয় থেকে উদ্ভূত নদীগুলিতে বন্যার সংখ্যা, বিস্তৃতি এবং ব্যাপকতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে গঙ্গা সমভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চলেও গঙ্গার উপনদীগুলিতে বন্যার প্রবণতা বেড়েছে।

ভারতে রাজ্যভিত্তিক বন্যায় বছরে গড় ক্ষতি

রাজ্যের নাম	গড় ক্ষতি কোটি টাকায়	রাজ্যের নাম	গড় ক্ষতি কোটি টাকায়
উত্তরপ্রদেশ	272.7505	তামিলনাড়ু	39.721
অন্ধ্রপ্রদেশ	257.0526	পশ্চিমবঙ্গ	37.5243
হিমাচলপ্রদেশ	221.3794	রাজস্থান	23.1291
কেরালা	212.0771	অরুণাচল প্রদেশ	19.2408
পাঞ্জাব	131.127	সিকিম	4.056
আসাম	130.9842	মধ্যপ্রদেশ	3.4401
ওড়িশা	124.9022	দমন এবং দিউ	3.234
বিহার	96.2399	পণ্ডিচেরি	2.7895
জম্মু ও কাশ্মীর	78.7265	মিজোরাম	2.088
কর্ণাটক	57.8416	মেঘালয়	1.45
গুজরাট	52.8501	ত্রিপুরা	0.963
মহারাষ্ট্র	49.1997	আন্দামান এবং	0.069
হরিয়ানা	48.1556	নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	
		মণিপুর	0.007

- এ ছাড়া খাদ্যশৃঙ্খল (food chain) ও খাদ্য জালিকা (food web) নষ্ট হয়।
- জল দূষিত হয়।
- মাটি দূষিত হয়। মাটি আম্লিক (acidic) হয়ে পড়ে।

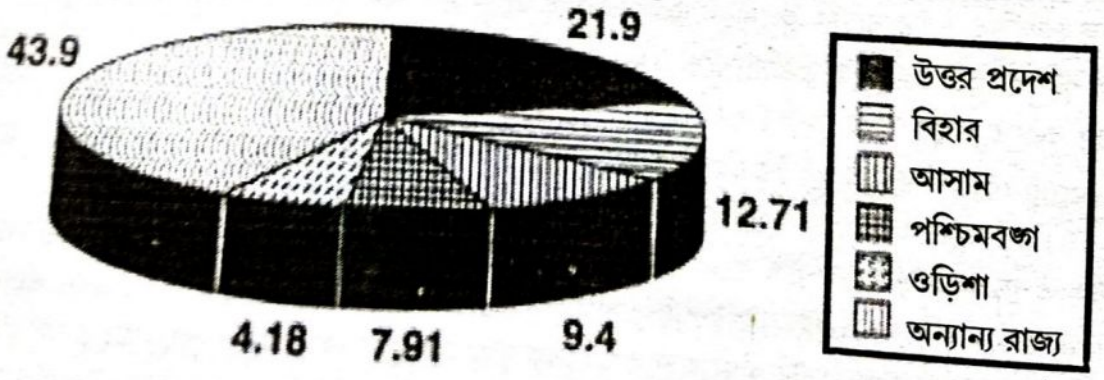

চিত্র 7 ঃ ভারতের বন্যাপ্রবণ এলাকা। মোট বন্যাপ্রবণ এলাকা 40 মিলিয়ান হেক্টর

বন্যা নিয়ন্ত্রণ (Flood Control) :

1950-55 সালে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সারা ভারতে যা ছিল 1966-67 সালে তা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে; 1971-75 সালে তিনগুণ এবং 1976-78 সালে পাঁচগুণ বেড়েছে। মোট কথা, বন্যা একটি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ঘটনা। তাই একে রোধ করা যায় না, তবে চেষ্টা করলে কিছু পরিমাণ রোধ করা যায়। বন্যার ভয়াবহতা কমিয়ে দেওয়া যায়। নীচে এরকম কয়েকটি উপায়ের কথা বলা হল :—

(a) আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই বৃষ্টি হবেই। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত যাতে মাটি ধুয়ে না নিয়ে যেতে পারে তার জন্য নদীর উচ্চ অববাহিকায় বনসৃজন করতে হবে।

(b) জলাধার বা Dam বানিয়ে বন্যার সময় নদীর জলের পরিমাণ কমানো যায়। জলাধারে জমা জল শুষ্ক ঋতুতে জলসেচের কাজে লাগানো যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামি ও টেনেসি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রক জলাধার তৈরি করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে।

(c) অত্যধিক নদী বাঁক বন্যা ঘটাতে সাহায্য করে। এজন্য বন্যা প্রবণ নদীর বাঁক কৃত্রিমভাবে কেটে সোজা করে দিলে বন্যার প্রকোপ কমে যাবে। মিসৌরি (Missouri) নদীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে খুব সুফল পাওয়া গেছে। তবে এই পদ্ধতি খুব ব্যয়সাপেক্ষ বলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটি প্রয়োগ করা হয় না বললেই চলে।

(d) বাঁধ ও বন্যা প্রতিরোধক দেওয়াল তৈরি করে নদীখাতের মধ্যে জলকে ধরে রাখা হয়। বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে এই ধরনের কৃত্রিম বাঁধ বানিয়ে নদী উপকূলবর্তী জনপদকে বাঁচানো যায়। পরের পাতার সারণিতে ভারতের রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন উচ্চতার বাঁধের সংখ্যা দেখানো হল। চিত্রে (নং 9) ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীর ধারে দেওয়া বাঁধ (Embanked) দেখানো হল।

(e) নদীকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে দিতে হবে। নদী উপত্যকায় যে-কোনো ক্ষতিকারক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। নদীর পাড়ে ভেড়ি বানানো চলবে না ইত্যাদি। দরকার হলে আইন বলবৎ করতে হবে। কারণ হিসেবে দেখা গেছে যে, নদীর মধ্যে বাঁধ দিয়ে ধীরে ধীরে নদী দখল করে চাষের জমি বা মাছের ভেড়ি তৈরি হয়। ফলে নদীর গতিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

(f) বাঁধের নীচে, নদনদীর নীচু অববাহিকায় বন্যার জল বিভিন্ন খাতে বইয়ে দেওয়ার জন্য ব্যারেজ তৈরি করা হয়। **'ঘাগর ভিন্নমুখ ব্যবস্থা'** (Ghaggar Diversion System) এমনই এক ব্যবস্থা। ঘাগর নদীর গতিপথে তৈরি এই ব্যারেজ বন্যার সময় 340 কিউমেক (কিউবিক মিটার প্রতি সেকেন্ডে) জল অন্যখাতে বইয়ে দিয়ে রাজস্থানে বন্যার প্রকোপ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

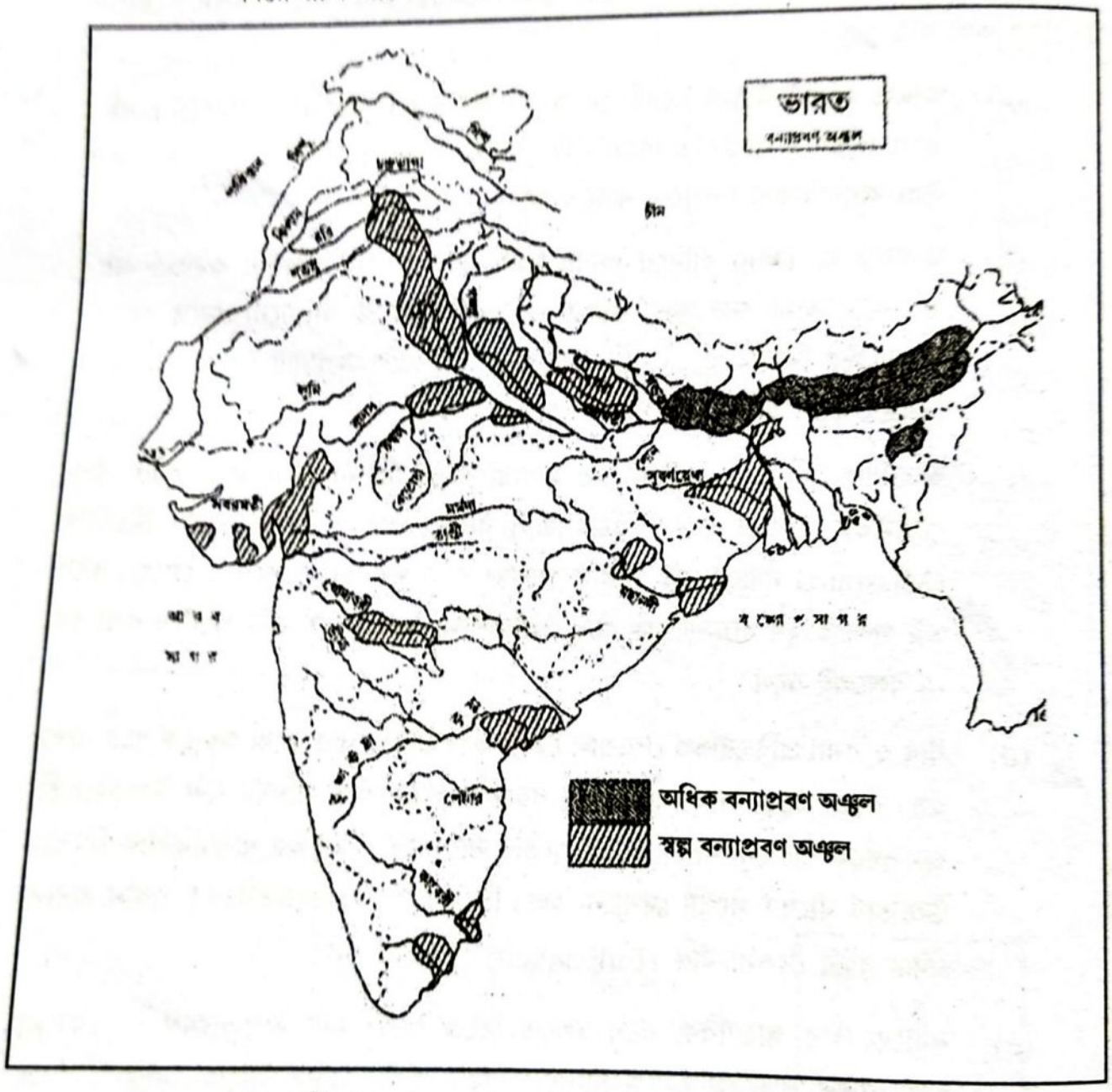

চিত্র 8 : ভারত বন্যাপ্রবণ অঞ্চল (Khuller অবলম্বনে)

(g) **বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্তকতা জারি করা :** ভারতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বেশ কিছুদিন ধরেই চলে আসছে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার 1954 সালে কেন্দ্রীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (Central Flood Control Board) গঠন করেছে। বন্যা

4. **নদীর চরিত্র ঃ** সবশেষে আসি **নদীর চরিত্র** আলোচনায়। নদীর চরিত্রের উপর বন্যার প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলিকে চরিত্র অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

(1) উত্তরের বরফগলা জলে পুষ্ট নদী, যেমন—তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা ইত্যাদি।

(2) পশ্চিমে ছোটোনাগপুর মালভূমি থেকে উৎপন্ন বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী। যেমন—দ্বারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি।

(3) বদ্বীপের শেষপ্রান্তে উপকূলীয় নদীজালিকা যেখানে নদীগুলি মোহানা থেকে জোয়ার-ভাটার জলে পুষ্ট। যেমন— মাতলা, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গের বন্যা

পূর্ব হিমালয়ের হিমবাহ থেকে সঞ্জাত তিস্তা নদীর কথা ধরা যাক। বর্ষাকালে এই নদীর জলস্রোতের তাণ্ডবে নদীতীরে শিলাস্তর ক্ষয় হয়ে নদীগর্ভে পতিত হয়। এইসব শিলাখণ্ড কখনও কখনও এত বিশাল আকারের হয় যে, তীব্র জলরাশির বেগও একে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে এই শিলাখণ্ডগুলি অস্থায়ী বাঁধের আকার নেয়। এই প্রাকৃতিক বাঁধের পিছনে ভেসে আসা গাছপালা, আরও অনেক কিছু জমে যায় এবং সেই সঙ্গে এর পিছনে জল জমতে জমতে স্বাভাবিক জলাধারের রূপ নেয়। কিন্তু জলের চাপে এই বাঁধ হঠাৎ একসময় ভেঙে গেলে, বিশাল জলোচ্ছ্বাস নদীগর্ভে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করে।

1968 সালে তিস্তা নদীর জল অনেক উঁচুতে কালীঝোরা বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বন্যার তাণ্ডবে তিস্তাবাজার ও সেবকের সেতুগুলি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। সবশেষে এই বিশাল জলরাশি তরাই সমভূমিতে নেমে আসে ও জলপাইগুড়িতে প্রলয়ংকরী বন্যায় প্রচুর জীবন ও সম্পত্তি হানি হয়। পাহাড়ে জ্বালানির জন্য বনভূমি কর্তন, অতিবৃষ্টিতে ধস নামা, নদীগর্ভে স্বাভাবিক বাঁধ সৃষ্টি—সবকিছু মিলে যে বন্যা ঘটে, তা রোধ করতে হলে বনভূমি সংরক্ষণ এবং মানুষের পরিবেশবান্ধব (Ecofriendly) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (যা ধসের মতো দুর্যোগকে ত্বরান্বিত করে না) করা খুবই জরুরি।

দক্ষিণবঙ্গের বন্যা

অনেক সময়ে দেখা যায় অতিবর্ষণ হয়নি কিন্তু সমভূমিতে নদীগর্ভ ক্রমাগত আবর্জনা ফেলার ফলে ভরাট হয়ে যায় এবং নদীখাতের ঢাল খুব কমে যায়। ফলে জলনিষ্কাশন সঠিক গতিতে হয় না এবং বন্যা ঘটে।

ছোটোনাগপুর থেকে আসা নদীগুলিতে বর্ষাকালে জলস্ফীতি দেখা যায়। কিন্তু এরা যখন প্রবল জলধারা নিয়ে পূর্বদিকে ধাবিত হয়, তখন সেই গতির পক্ষে বাধা হিসেবে দাঁড়ায়, আড়াআড়িভাবে নির্মিত রেলপথ, রাজপথ ইত্যাদি। এই রেলপথ বা রাজপথের নীচে জল নিষ্কাশনের পথগুলি খুব ছোটো এবং অধিকাংশই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় বুঁজে গেছে। ফলে এর মধ্য দিয়ে দ্রুত জলনিষ্কাশন সম্ভব হয় না। এই ঘটনা বর্তমানে প্রায়শই ঘটে।

উত্তরবঙ্গে পাহাড়ে তৈরি রেলপথের জন্য জলপাইগুড়ি, কোচবিহারেও বন্যা হয়।

গঙ্গার বদ্বীপে দক্ষিণ দিকের নদীগুলি প্রায় পুরোটাই জোয়ারের জলে পুষ্ট। বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলে বন কেটে বসত তৈরি করার জন্য নদীর দু'ধারে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয়েছে। কিন্তু বর্ষাকালে ঘূর্ণবাতের প্রভাবে যখন বিপুল জলরাশি নদীর ভেতরে ঢুকতে থাকে, তখন এই বাঁধগুলি জলের চাপে ভেঙে পড়ে এবং দু'কূল উপচিয়ে বন্যা ও ভূমিক্ষয় ঘটে।

কাজেই বোঝা যাচ্ছে বর্তমানে বন্যা আর কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, মানুষের অপরিণামদর্শিতা এই দুর্যোগের পিছনে সমানভাবে দায়ী।

বন্যা প্রতিরোধ

বন্যা প্রতিরোধ করতে হলে দরকার নদীর চরিত্র এবং সার্বিক পরিবেশের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক আছে, সেটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। এর জন্য অভিনিবেশসহকারে জানতে হবে—

(1) নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় মোট জলের পরিমাণ।

(2) ওই অঞ্চলে ভৌমজলের অবস্থা ও পরিমাণ এবং ভৌমজলের ঋতুগত ও উচ্চতাগত তারতম্য।

(3) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও নদীর জলধারণ ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক।

(4) ধারণ অববাহিকায় জলপ্রবাহের গতিবেগ।

(5) নদী অববাহিকার আয়তন, আকৃতি, ভূমিঢাল, গড় উচ্চতা, এবং অববাহিকার চরিত্র—অর্থাৎ নদীর ঘনত্ব, নদী অববাহিকায় অবস্থিত জলাধার ও পুষ্করিণীর সংখ্যা।

(6) নদী দ্বারা বাহিত পললরাশির পরিমাণগত প্রকৃতি ও তাদের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ।

(7) মৃত্তিকার উপাদান।

(8) নদী উপত্যকায় জলের recharge ও discharge কীভাবে হয়।

এই বিষয়গুলি বোঝার জন্য অনেকরকম গাণিতিক হিসাব ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। এইসব হিসাব ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নদী অববাহিকায় জলপ্রবাহের লেখচিত্র (যেমন—হাইড্রোগ্রাফ, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, রেটিং কার্ভ ইত্যাদি) অঙ্কন করা যায়। এই পদ্ধতিগুলিকে কাজে

লাগিয়ে সম্ভাব্য বন্যা সম্বন্ধে মানুষ সতর্ক হতে পারে। তা ছাড়া নগরে, শিল্পাঞ্চলে জলের জোগান, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচ ব্যবস্থা, জলভিত্তিক আমোদ-বিনোদন, নৌপরিবহণ, মৎস্যসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও সাহায্য পাওয়া যায়।

বন্যার ক্ষতিকারক প্রভাব

প্রতিবছর পৃথিবীতে বন্যার ফলে প্রায় 20,000 লোকের মৃত্যু হয় এবং 20 মিলিয়ন মানুষ কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেশিরভাগই গৃহহারা বা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া মহাদেশে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে বেশি ঘটে। নিম্নের সারণি থেকে এশিয়া ক্ষয়ক্ষতির চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

1900-2006 সময়ের মধ্যে বন্যার প্রভাবের শতাংশের হিসাব—

মহাদেশ	বন্যার সংখ্যা (%)	মানুষের মৃত্যু (%)	আহতের সংখ্যা (%)	গৃহহারার সংখ্যা (%)	প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা (%)	অর্থনৈতিক ক্ষতি (%)
আফ্রিকা	17	0.5	2	4	1	1
দুই আমেরিকা	25	1	3	3	2	17
এশিয়া	41	98	93	91	96	58
ইউরোপ	14	0.5	2	2	1	23
ওশিয়ানিয়া	3	—	—	—	—	1

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), Belgium-এর তথ্য সারণি থেকে গৃহীত।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে চীন এবং বাংলাদেশ হল বন্যার প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি দেশ।

বন্যার জলে ডুবে মানুষের মৃত্যু হয়। বন্যার সময় মানুষ ও প্রাণীরা একইসঙ্গে কোনো উঁচু স্থান বা গাছে আশ্রয় নেয়। এইসময় সাপের কামড়েও অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এইসময় সাপের কামড়েও অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এইসময় নিকাশি ব্যবস্থায় দূষিত জল, কৃষিক্ষেত্রের কীটনাশক প্রভৃতি বন্যার জলে মিশে যায়। জলের উৎস যেমন পুকুর, কুয়ো, নলকূপ প্রভৃতি জলে ডুবে গিয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের আকাল দেখা দেয়। ফলে আন্ত্রিক, কলেরা প্রভৃতি রোগ মহামারী হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে, বহু মানুষের মৃত্যু ঘটায়। এছাড়াও টাইফয়েড প্রভৃতি জলজনিত রোগ বা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মশাজনিত রোগ ছড়িয়ে পড়েও পরিস্থিতি ভয়ংকর করে তোলে। চোখের সামনে নিজস্ব সম্পত্তির ধূলিসাৎ হওয়া বা প্রিয়জনের মৃত্যু দেখা মানুষ মানসিকভাবেও

বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বন্যার ফলে শস্যহানি হয়। পাড় ভাঙন বা ভূমিক্ষয়ের সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়।

বন্যার উপকারী প্রভাব

খুব তীব্র আকার ধারণ না করলে, বন্যার ফলে মানুষ ও পরিবেশের কিছু উপকারও হয়। বন্যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে নতুন পলির আস্তরণ পড়ে, ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে। এছাড়া একটানা কৃষিকার্য চলতে চলতে কৃষিক্ষেত্রের মাটি নোনা হয়ে যায়। বন্যার জল সেই নুন ধুয়ে দিয়ে কৃষির উপকার করে। বন্যার অতিরিক্ত জলের শক্তি অনেকসময় নদীখাতের জমা পলি সরিয়ে দিয়ে নদীকে মজে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচায়। বর্ষার অতিরিক্ত জল বাঁধ ও জলাধারের সাহায্যে ধরে রাখতে পারলে শুষ্ক সময়ে জলসেচের কাজে লাগে। নদী ও জলাশয়গুলি ভরে যাওয়ার ফলে মাছ চাষ ও মাছ ধরার সুবিধা হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বন্যার মানচিত্র, হাইড্রোগ্রাফ, ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ, রেটিং কার্ভ ইত্যাদি কীভাবে অঙ্কন করা যায় সেই আলোচনা করব।

বন্যার মানচিত্র অঙ্কন

বন্যার মানচিত্র অঙ্কন নির্ভর করবে বন্যাসম্পর্কে কী ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে তার উপর। আবার ওই তথ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে ওই মানচিত্র ভবিষ্যতে কীভাবে কাজে লাগবে।

বন্যার মানচিত্র দু'ভাবে করা যেতে পারে—

(1) কোনো একটি নির্দিষ্ট বন্যার ঘটনা মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা।

(2) কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ধরে, যেমন— গত 50 বছরে বিভিন্ন এলাকা কতবার করে বন্যাকবলিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তির হার বার করা। এভাবে কোন এলাকা কতটা বন্যাপ্রবণ তা বার করা যাবে।

(1) **কোনো একটি নির্দিষ্ট বন্যা ঃ** ধরা যাক 2000 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 6.দিন টানা বৃষ্টি চলার পর, নদীর জল উপচে, পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলা বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে। এবারে মানচিত্র কীভাবে করা যাবে তা দেখা যাক—

(ক) প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গে ওই দিনগুলিতে বিভিন্ন কেন্দ্রে বৃষ্টিপাত কত হয়েছিল তা মানচিত্রে বসিয়ে আইসোহাইট বা সমবর্ষণ রেখা টানতে হবে।

(খ) যদি উচ্চতা, সমোন্নতি রেখা বা spot height পাওয়া যায়, তাই দিয়ে বন্ধুরতার একটি মানচিত্র করা যেতে পারে।

(গ) এবারে পশ্চিমবঙ্গে নদনদী দেখিয়ে একটি মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে।